বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 627. November, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৭ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩২২। নভেম্বর, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

BENGAL LIBRARY 10. 1916 WRITERS BUILDINGS

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উপাসক সম্প্রদায়।

হিন্দুধর্ম্ম।

অচিন্ত্য অব্যয় পরমাত্মা হইতে এই অদ্ভুত বিশ্ব সংসার-রূপী-বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা উর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ (উর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং ইতি-তন্ত্রং)। এজন্য ইহা অশ্বত্থ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই সংসারকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ। অশ্বত্থ শব্দে নশ্বর, যথা (ন শ্বঃ স্থাস্যতীতি অশ্বত্থঃ) যাহা কল্য থাকে না তাহাই অশ্বত্থ। এ কারণ সংসারকে অশ্বত্থ বলিয়া বৃক্ষাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বৃক্ষের উর্দ্ধে মূল অর্থাৎ ইহা পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট। এই আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে তমঃ, তমঃ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী। এই পঞ্চভূত সমবেত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর বস্তু সকল উৎপাদন করিয়াছে, সুতরাং উর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষাকার সংসারের মূলত্রয় সত্ত্বরজস্তম অব্যক্ত। ইহার প্রধান শাখা-দ্বয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। দশ দশ বিভাগে শাখাদ্বয়ের বিংশতি প্রকার উপশাখা আছে। (ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং) ইতি মনুঃ। অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধীঃ, বিদ্যা সত্য এবং অক্রোধ — এই দশপ্রকার ধর্ম্মশাখার উপশাখা।

অজিতেন্দ্রিয়তা, শাঠ্য, অক্ষমা, অসদ্বুদ্ধি, স্তেয়, অসদাচার, ক্রোধ, পৌশুণ্য, নাস্তিকতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দশ প্রকার অধর্ম্মশাখার উপশাখা। সংসার-রূপ বৃক্ষের পুষ্প বিদ্যা ও, অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান, এবং ফল—স্বর্গ ও নরক, অর্থাৎ বিষ অমৃত তুল্য সুখ এবং দুঃখ। এই ধর্ম্মাধর্ম্মময় সংসার স্বরূপ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ শাখাতেই মানবগণ সমারূঢ় হইয়া পরস্পর ধর্ম্মাধর্ম্মীরূপে এক বৃক্ষারোহণ করিয়া রহিয়াছে। হিন্দুগণ ধর্ম্মকেই পরম মঙ্গল বলিয়া জানেন। হিন্দুরা ধর্ম্মার্থে দারপরিগ্রহ করেন—ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, ধর্ম্মার্থেই পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন—অপত্য-পোষণের নিমিত্ত নহে। হিন্দুরা আপনার নিবাসার্থে নহে পরন্তু ধর্ম্মার্থেই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। মানবেতর জন্তু মাত্রেই স্ত্রীপুত্র গৃহাদি করিয়া বাস করে কিন্তু হিন্দুরা দৈবপৈত্র কর্ম্মে এবং অতিথি সেবা পরায়ণ হইবার জন্তই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন—ইহাই হিন্দুদিগের বিশেষত্ব। আত্মাস্বাদে আত্মোদর পূরণ করিবার জন্য নহে পরন্তু ধর্ম্মার্থেই হিন্দুরা ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগার্থ তাঁহারা দেহ ধারণ করেন না, পরন্তু ধর্ম্মার্থেই তাঁহারা দেহ ধারণ করেন (১)। তাঁহারা জানেন জীব মাত্রেই একা জন্মে, একাই বিনাশকে প্রাপ্ত হয় এবং একাই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করে (২)। পরলোকে সহায়ার্থ মাতা পিতা, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি কেহই থাকেন না, কেবল এক ধর্ম্মই তৎকালে সাহায্যার্থ অবস্থিতি করেন (৩)। কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ মৃত শরীরকে মহীতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া বন্ধুবান্ধবেরা বিমুখ হইয়া গমন করে, কিন্তু পরম করুণাময় ধর্ম্ম তৎকালে পরিত্যাগ করেন না (৪)। এই জন্যই হিন্দুর নিকট ধর্ম্মের এত আদর। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, কৌটিল্য এই পঞ্চকে বশ করাই ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুরা জানে (৫)। কাম, ক্রোধ সমাসক্ত ব্যক্তির অনন্ত দুর্গতি হয় বলিয়া মনু হিন্দুগণকে কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন হইতে দূরে অবস্থিত হইবার আদেশ দিয়াছেন। কামজ ব্যসন দশবিধ এবং ক্রোধজ অষ্টবিধ। মৃগয়া, জুয়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষ কথন, স্ত্রীলোকে আসক্তি,

(১) ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ। ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনং। ধর্ম্মার্থে ধ্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী। ধর্ম্মার্থে বর্ত্ততীজ্যোপি ধর্ম্মার্থে তপ্যতে রবিঃ। (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং)।

(২) একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃত মেক এবতু দুষ্কৃতং।

(৩) নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি। ন পুত্র দারাঃ ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ। মনু ৪ অ।

(৪) মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ। বিমুখাঃবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।

(৫) কামক্রোধৌ বশেকৃত্বা দম্ভং লোভমনার্জ্জবং। ধর্ম্মইত্যেব সন্তুষ্টা স্তেশিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ। বনপর্ব্বং।

মদ্যপান জনিত মত্ততা, বাদ্য, নৃত্য, গীত এবং বৃথা-পর্য্যটন এই দশটী কামজ দোষ মধ্যে পরিগণিত। পিশুনতা (না জানিয়া অন্যের দোষ কথন), দুঃসাহস (কুকার্য্যে সাহস), দ্রোহ (পরোপকার করা), ঈর্ষা, অসূয়া (দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা) অর্থ দূষণ (পরস্বাপহরণ বা অবশ্য দেয় ধন না দেওয়া) বাক্ পারুষ্য এবং অত্যন্ত তাড়না—এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ (৬)। এই গুলিকে পরিহার করিয়া হিন্দু সংযত হন। হিন্দুর দয়া, অহিংসা, সত্য ও শান্তিই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। কেবল হিংসা না করিলেই দয়া হয় তাহা নহে। হিন্দুর দয়ার ষড় অঙ্গ, যথা প্রথম পরোপকার করণ, দ্বিতীয় সাধ্যানুসারে দান, তৃতীয় হাস্যযুক্ত বাক্য কথন, চতুর্থ বিনয়, পঞ্চম নম্রভাব, ষষ্ঠ স্বীকারের সমাধা করণ। (ক) পৃথিবীর অন্যান্য যে সকল ধর্ম্মে অহিংসা ধর্ম্মের বিধি আছে তাহাতে প্রাণীবধ না করাই অহিংসা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর অহিংসা জ্ঞান অষ্টবিধ যথা (১) কোন জীবের জীবনের ব্যাঘাত করিবে না, (২) জিতাসন হইবে অর্থাৎ ধারাবাহিক ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিবে না, (৩) পর পীড়াদায়ক হইবে না, (৪) শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু এবং শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিবে, (৫) অতিথি সেবা পরায়ণ হইবে, (৬) শান্তরূপ প্রদর্শন করিবে অর্থাৎ জীবের ভয়প্রদ হইবে না, (৭) সকলের সহিত আত্মীয়তা করিবে এবং (৮) আপনি যেমন পরকেও সেইরূপ দেখিবে (খ) হিন্দু মাত্রেই সত্যের ঘোর পক্ষপাতী। হিন্দু জানে কেবল সত্য কথা কহিলেই সত্য ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সত্যের দ্বাদশাঙ্গ (১) মিথ্যা বাক্যের উপরতি (২) অঙ্গীকারের প্রতিপালন (৩) প্রিয়বাক্য কথন (৪) গুরু সেবা করণ (৫) প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা (৬) ব্রতানুষ্ঠান করণ (৭) আস্তিকতা (৮) সৎসঙ্গ (৯) মাতা পিতার প্রিয়কর্ম্ম সাধন (১০) ত্রিবিধ প্রকার শৌচকরণ অর্থাৎ কায় মন এবং বাক্য শুদ্ধি (১১) লজ্জাবুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ কুলোচিত কর্ম্মের ব্যাঘাত না করণ এবং (১২) অসঞ্চয়তা অর্থাৎ কৃপণতার ন্যূনতা।

হিন্দু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন।

হিন্দু পরমেশ্বরের উপাসক। শ্রুতি স্মৃতি এবং পুরাণ সকলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র রুদ্রাদি দেবতা পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইঁহারা ঈশ্বরেতর অন্য দেবতা নহেন, অনেক হইয়াও এক। ইঁহাদিগের মধ্যে যে কোন রূপের

(৬) মনু ৭ম অধ্যায় শ্লোক ৪৭—৪৮।

(ক) পরোপকার দানঞ্চ সর্ব্বদাস্মিতভাষণং। বিনয়ো ন্যূনতাভাবঃ স্বীকার সমতামতিঃ। ষড়বিধেয়ং দয়া প্রোক্তা শৃণুশান্তিরথো মুনে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং।

(খ) অহিংসাত্মাসকলঃ পর পীড়া বিবর্জনং। শ্রদ্ধাচাতিথি সেবাচ শান্তিরূপ প্রদর্শনং। আত্মীয়ত্বাচ সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধিঃ পরাত্মনি। ইতি নানাবিধাঃ প্রোক্তা অহিংসেতি মহামুনে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং।

উপাসনা কর তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। পৃথিবীতে অনেক জীব, অনেক পদার্থ, অনেক জাতি, অনেক গুণ, অনেক সংযোগ, অনেক প্রকার, অনেক বিশেষত্ব আছে, সুতরাং উপাসনা অনেক প্রকার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই সকল দেবতা এক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাঁদিগের একের প্রশংসাতে সকলের প্রশংসা হয় ও একের নিন্দায় সকলের নিন্দা হয়। হিন্দুদিগের ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যে এক তাহা মৈত্রেয়োপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকে জানিতে পারা যায় যথাঃ—

ত্বংব্রহ্মাত্বঞ্চবৈ বিষ্ণু স্ত্বং রুদ্র স্ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বমগ্নির্বরুণোবায়ু স্ত্বমিন্দ্র স্ত্বং নিশাকরঃ। ত্বং মনস্ত্বং যমশ্চ ত্বং পৃথিবী ত্বমথাচ্যুত॥ স্বার্থে স্বাভাবিকের্থে চ বহুধা তিষ্ঠসে দিবি॥

অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি বায়ু, তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি মন, তুমি যম, তুমি পৃথিবী, এই বিশ্বকার্য্য সাধনার্থ বা উপসনার্থ বহুরূপে স্বর্গাদি লোকে অবস্থিতি করিতেছ।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী লিখিত।

হোসন বসোরীর বৈরাগ্য।

মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় এই মুসলমান সাধু হোসনের বৈরাগ্য জীবনের কাহিনীও অপূর্ব্ব। হোসন বসোরী একজন বিখ্যাত মুসলমান তাপস। প্রথম জীবনে ইনি মণিমাণিক্যের ব্যবসায়ী ছিলেন।

মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের যে কারণে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তাঁহাকে বোদ্ধত্বে স্থাপন করিয়াছিল, এই মণিকার হোসন বসোরীর জীবনও সেই কারণেই পরিবর্ত্তিত হইয়া ঋষিত্ব লাভ করে।

একদা হোসন বসোরী বাণিজ্য উপলক্ষে রোম নগরে যান এবং তথাকার মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হন। মন্ত্রীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। এক দিন হোসন মন্ত্রীর সহিত অশ্বারোহণে নগরের অনতিদূরে এক প্রান্তরে গমন করেন। তথায় যাইয়া তিনি মণিমুক্তা খচিত পট্ট বস্ত্রের এক বৃহৎ পট্টমণ্ডপ দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন একদল সুসজ্জিত সৈনিক পুরুষ সেই পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া রোমীয় ভাষায় কিছু বলিয়া চলিয়া যাইল। তদনন্তর তিনি দেখেন যে কতিপয় উজ্জ্বল বেশধারী বর্ষীয়ান পুরুষ মহা ঘটা করিয়া আসিয়া তদ্রূপ আচরণ করিলেন। তৎপরে শত শত পণ্ডিত আসিয়া পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া ও কিছু বলিয়া প্রস্থান করিলেন, পরে একদল শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু বিশিষ্ট বৃদ্ধ আসিয়া ঐরূপ আচরণ করিলেন। তাহার পর একদল রূপবতী রমণী মণিমুক্তা পূর্ণ সুবর্ণ পাত্র

লইয়া পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কিছু বলিয়া চলিয়া যাইল। অবশেষে সম্রাট সচিব বৃন্দসহ সেই বস্ত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইয়া চলিয়া যাইলেন। হোসেন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন বন্ধু, এই ব্যাপারের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তুমি যদি জান ত আমাকে বুঝাইয়া দাও। মন্ত্রী বলিলেন, অত্রত্য সম্রাটের অশেষ গুণসম্পন্ন এক পুত্র ছিল, সম্রাট তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই রাজকুমার অকস্মাৎ মহারাজকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই পট্টমণ্ডপের ভিতরে সেই রাজপুত্রেরই সমাধি রহিয়াছে। প্রতি বৎসর পুত্রের মৃত্যু দিনে নরপতি সসৈন্যে অমাত্য-বন্ধু-পরিজন সমভিব্যাহারে এস্থানে উপস্থিত হন ও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সেই সর্ব্ব শক্তিমানের ইচ্ছার নিকট নিজ শক্তি তুচ্ছ জানিয়া পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ভগ্ন প্রাণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তুমি প্রথমে যে সৈন্যদলকে পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া কিছু বলিতে দেখিলে তাহারা সম্রাটের মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তাহারা আসিয়া বলিল, রাজকুমার! আমাদের বাহুবলে যদি তোমাকে জীবিত রাখিবার সাধ্য থাকিত তাহা হইলে স্ব স্ব প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শমনের হস্ত হইতে তোমাকে পুনঃগ্রহণ করিতাম, কিন্তু যিনি তোমার এই অবস্থা সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কোনরূপ সংগ্রাম চলে না, এজন্য আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তৎপরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ আসিয়া পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করণান্তর বলিলেন রাজকুমার! আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের সমুদয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি তোমাকে রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমাকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা অক্ষয় যশ লাভ করিতাম, কিন্তু বিধাতা পুরুষের উপর আমাদের বিদ্যা ও জ্ঞান খাটে না, তাঁর শক্তির নিকট আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত। তৎপরে বিদ্বন্মণ্ডলী আসিয়া বলিলেন, রাজতনয়, যদি জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বলে মহারাজের এ দুঃখ দূর করিতে পারা যাইত তাহা হইলে আমরা তাহা করিতাম। অনন্তর সম্মানিত বৃদ্ধগণ আসিয়া বলিলেন, নৃপনন্দন! যদি আমাদের আশীর্ব্বাদ বলে ও শোক প্রকাশে তোমার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমরা তাহা হইতে কখন বিমুখ থাকিতাম না। পরে সুন্দরীগণ রত্নপূর্ণ থালা হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল, হে কুমার! যদি ধন, সম্পদ ও সৌন্দর্য্য বলে তোমাকে জীবিত করিতে পারিতাম তাহা হইলে তোমার জন্য সমুদয় উৎসর্গ করিতাম, কিন্তু যিনি এই ঘটনার প্রবর্ত্তক তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, রূপ ও যৌবনের কোনও মূল্য নাই। সর্ব্বশেষে সম্রাট আসিয়া বলিলেন, হে আমার প্রাণাধিক

পুত্র! তোমার পিতার হস্তে যে আর কোনও ক্ষমতা নাই!! আমি তোমার জন্য বৃহৎ সৈন্যদল আনয়ন করিয়াছি, সুবিখ্যাত অভিজ্ঞ চিকিৎসক, পণ্ডিতমণ্ডলী, সম্মানিত বৃদ্ধগণ ও রূপযৌবন-সম্পান্না স্নেহময়ী রমণী এবং অতুল ধন সম্পদ যাহা কিছু আমার আছে সকলি লইয়া আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এ সকল দ্বারা যদি আমার প্রিয়তম পুত্র! এ বিপদের নিরাকরণ হইত তাহা হইলে সমস্ত দিয়া যতদূর সাধ্য তাহার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যিনি এই ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন, হে পুত্র! তোমার পিতা এবং সমুদয় জগৎ তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বল। অতএব সর্ব্বোপরি সেই মহা শক্তিমান পুরুষের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া যাইলেন।

মন্ত্রীর এই সকল কথায় হোসন বসোরীর অন্তরে অনুতাপ ও প্রবল বৈরাগ্য আনয়ন করিল। তিনি বলিলেন, হায়! আমি প্রাণপণ শক্তিতে সংসারের যে সকল সুখ অর্জ্জন করিতে নিযুক্ত আছি তাহার মূল্য কিছুই নয়? হোসন অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাণিজ্য হইতে বিরত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বিষম বৈরাগ্য ও অনুতাপের অগ্নি তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জ্বলিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে পাপ বিকারসহে আর সংসারের হাস্যামোদে যোগ দিব না। তৎপরে এরূপ কঠোর সাধনাতে নিযুক্ত হইলেন যে ঈশ্বর দর্শন লাভ না করিয়া উঠিবেন না। পরে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং তাপসশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ লিখিত আছে যে তিনি যখন কোন স্থানে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন সেইস্থলে তপস্বিনী রাবেয়া যদি উপস্থিত না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ দেওয়া হইত না। ইহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন সত্য শ্রবণের জন্য অনুতপ্ত ব্যাকুল আত্মার নিকটই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া স্বার্থক হয়, অন্যের নিকট তাহা বিফল, এজন্য তৃষিত ব্যক্তি আছে কি না, না দেখিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। তপস্বিনী রাবেয়া আসিলে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকি।

ইষ্টলিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রমভঙ্গ।

যুবক লেভিসন কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার কাহার প্রতি কিরূপ করিতে হয় তাহা বেশ জানিতেন, অতি অল্প লোকেই ইহার ন্যায় শ্রোতার মন হরণ করিতে পারে, আবার অতি অল্প লোককেই ইহার ন্যায় হৃদয়হীন পাষণ্ড পশুপ্রকৃতি দেখা যায়। কিন্তু হায় তথাপি পৃথিবীতে ইহার স্থান ছিল, সমাজের

লোকে ইহাকে সম্মান করিত, কারণ তাহারা জানিত যে কালে এই যুবকই বৃদ্ধ ধনী স্যার পিটার লেভিসনের (মিসেস্ লেভিসনের) বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

বৃদ্ধা বলিলেন, "ক্যাপ্টেন লেভিসন! ইনি লেডী ইসাবেল ভেন"। তিনি তাহাদের দুইজনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এবং সেই সময় কুটিল সংসার পথের নূতন যাত্রী সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ শিশু ইসাবেল, নিজের প্রতি যুবক লেভিসনের প্রশংসাপূর্ণ আগ্রহ দৃষ্টি দেখিয়া লজ্জায় অভিভূত হইতেছিল। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য সে যে দুই ব্যক্তির সঙ্গে একদিনে একসময়ে পরিচিত হইল এই দুই ব্যক্তিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গি হইবে ও তাহার উপর আধিপত্য করিবে।

চা পান সমাপ্ত করিয়া ইসাবেল মিসেস্ ভেনের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে মিসেস্ লেভিসন বলিয়া উঠিলেন, "এ যে অতি সুন্দর ক্রুশ মা", ইজাবেলের গলদেশে যে স্বর্ণনির্ম্মিত সাতটী মণিযুক্ত ক্রুশ ছিল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে গুলি অতি সুন্দর সূক্ষ্ম স্বর্ণহারে গ্রথিত ছিল।

ইসাবেল বলিল, "ইহা কি সুন্দর নয়?" আমার স্নেহময়ী জননী মৃত্যুর সময়ে ইহা আমাকে দিয়া গিয়াছেন। দাঁড়ান এটী আমি আপনার হাতে দিতেছি। কোন বিশেষ সমারোহের দিনে আমি ইহা গলায় পরি।

পাঠিকাগণ পল্লী গ্রামবাসী সংসার জ্ঞানাভিজ্ঞ বালিকা, ডিউকের বাড়ীর এই সামান্য আয়োজনকেই মহাসমারোহ ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে তাহার ক্রুশযুক্ত স্বর্ণহার গলা হইতে খুলিয়া মিসেস্ লেভিসনের হস্তে দিল।

মিসেস্ ভেন এই সময় বলিয়া উঠিলেন, ইসাবেল, "এই সামান্য ক্রুশ ও কতকগুলা মুক্তা দেওয়া সেকালের ব্রেসেলেট্ ব্যতীত তোমার কি আর কোনও গহনা নাই?" আমিত তোমাকে ইহা ব্যতীত অন্য গহনা পরিতে কখন দেখি নাই।

ইসাবেল বলিলেন, "আমার মা এই দুইটী গহনা আমাকে দিয়াছেন। এই দুইটীই তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

মিসেস্ ভেন সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "তুমি সে কেলে ধরণের মেয়ে! কারণ তোমার মা যখন ইহা পরিতেন সে দিন চলে গিয়াছে, এখনও কি তুমি তাই পরিবে? "তুমি তোমার হীরার গহনা পরনা কেন?

ইসাবেল থতমত খাইয়া উত্তর দিল "আমি—হীরার; গহনাও পরি; কিন্তু সকল সময় তাহা পরিতে ভালবাসি না।"

মিসেস্ ভেন—"কিসের জন্য পর না?"

ইসাবেল সলজ্জভাবে বলিল, "আমি হীরা মুক্তার গহনা পরিয়া জমকাল ভাব দেখাইতে ভালবাসি না। ঐ সব গহনা এত জলজলে যে আমার ভয় হয়

পাছে কেহ ভাবে ঐ সব গহনা পরে আমি সুন্দরী দেখাতে চাই।"

ঘৃণা সূচক দৃষ্টিতে তাকাইয়া মিসেস ভেন বলিলেন, "ওঃ! আমি দেখ্‌চি তুমি যে নিজেকে খুব ভোগবিলাসহীন ও গহনা প্রিয় নও বলিয়া দেখাতে চাও? লেডী ইসাবেল! এ ভাল দেখাবার একটা বেশ ছল।"

মিসেস্ ভেন এইকথা যে ভাবেই বলুন না কেন, ইসাবেল মনে করিল হয়ত কোনও কারণে আজ মিসেস্ ভেনের মেজাজ ঠিক নাই, সেই জন্য তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। সত্য সত্যই ইহার কারণ ছিল, এবং সে কারণ আর কিছুই নহে, ক্যাপ্তেন লেভিসন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সৌন্দর্য্য প্রতিমা ইসাবেলের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই অপমানজনক।

বৃদ্ধা বলিলেন, "বৎসে! এই নাও তোমার ক্রুশ", এটা বাস্তবিকই বড় সুন্দর, তোমার গলায় ইহা হীরা মুক্তা অপেক্ষা ভাল দেখাইবে। আর তোমার মিছে সাজসজ্জার দরকার নাই তোমার যেরূপ আছে তাহাই যথেষ্ট। মা! তুমি এম্মার কথায় কিছু মনে করিও না। ফ্রান্সিস লেভিসন লেডী ইসাবেলকে দিবেন বলিয়া বৃদ্ধার হাত হইতে ক্রুশটী লইলেন। দিবার সময় তাঁহার ইচ্ছাকৃত দোষেই হউক অথবা লেডী ইসাবেলের হস্তে দস্তানা প্রভৃতি থাকায় ঠিকমত ধরিতে না পারার দোষেই হউক ক্রুশটী মাটিতে পড়িয়া যাইল, এবং যুবক লেভিসন তাড়াতাড়ি সেইটী তুলিতে যাইয়া পা দিয়া মাড়াইয়া ফেলায় ক্রুশখানি ভাঙ্গিয়া দুখণ্ড হইয়া গেল।

মিসেস্ লেভিসন চেঁচিয়ে উঠিলেন আঁা! "কার দোষে এ ভাঙ্গিল?"

ইসাবেল কোন উত্তর দিল না, তখন তার ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল। ভাঙ্গা ক্রুশটী হাতে নিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চোখ দিয়ে জল পড়িতে লাগিল। সে চোখের জল কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না। ক্যাপ্তেন লেভিসন নিজ অশিষ্টতার জন্য অনুতাপের ভান করিতেছিলেন, এমন সময় মিসেস্ ভেন্ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "কেন আমি এই সামান্য একটা ক্রুশের জন্য কাঁদিব!" মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, "তুমি এটা সারিয়ে নিতে পারিবে না?" লেডী ইসাবেল এই কথায় চোক্ষের জল মুছিয়া প্রফুল্ল মুখে ক্যাপ্তেন লেভিসনের প্রতি চাহিয়া বলিল এর জন্য আপনি একা দোষী ইহা মনে করিবেন না, আমাদের দুজনেরই সমান দোষ হইয়াছে।" আর মিসেস্ লেভিসন যখন বলছেন সারিয়ে নেওয়া যাইবে তখন আর দুঃখ কি। সে ভাঙ্গা ক্রুশের অর্দ্ধেকটা শুদ্ধ হারটী যেমন গলায় পরিল, মিসেস্ ভেন অমনি বলিয়া উঠিলেন "তুমি এই সরু হারটী কেবল গলায় দিয়ে যাবে? তোমার কি আর কোনও গহনা নাই?"

ইসাবেল বলিল "কেন যাব না?"

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিব "ক্রুশটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

মিসেস্ ভেন বিদ্রূপের সহিত হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন 'যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে!' "বাছা কেউ তোমাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু তারা মনে করিবে যে মাউন্ট সভারিণের মেয়ের একখানিও হীরা মুক্তার গহনা নাই।"

ইসাবেল ঈষৎ হাস্য করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, তাহারা সে দিনকার সভায় আমার হীরার গহনা দেখিয়াছে।

বৃদ্ধা এই সময় বলিয়া উঠিলেন, "ফ্রান্সিস লেভিসন, যদি তুমি আমার এই রকম কোনও জিনিস নষ্ট করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছমাস এ বাড়ীতে ঢুকিতে দিতাম না। এখন এস্মা তোমরা যাও, তোমাদের নাচ ত রাত দশটার সময় আরম্ভ হবে! আমাদের সময় সন্ধ্যা সাতটার সময় আরম্ভ হইত, কিন্তু এখন সে সব রীতি বদ্‌লে গেছে।"

ক্যাপ্টেন বিদ্রূপের সহিত বলিল, তাহা হইলে আমি মিসেস্ ভেন অপেক্ষা ঠাকুর-মাকে অধিক ভক্তি করিতাম। তৃতীয় জর্জ্জের সময় ত একটার সময় ভেড়ার মাংস সিদ্ধ ও সালগমেতেই ভোজন ব্যাপার শেষ হইত!"

তৎপরে তিনি ইসাবেলের হস্ত ধারণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

এই রাত্রিতে পুনরায় আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার গাড়িতে উঠিবার সাহায্য করিল। মিসেস্ ভেন তাহারই সহিতই নীচে আসিলেন, তাঁর ব্যবহার তখনও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল না।

ইসাবেল, ক্যাপ্টেনকে "ধন্যবাদ দিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। ক্যাপ্টেন বলিলেন, "আমি কিন্তু আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারিব না, কারণ এখনি আবার আপনার সহিত আমার দেখা হইবে।"

মিসেস্ ভেন বলিলেন, "তুমি না আমাকে বলিলে 'আমি যাইতে পারিব না, আর এক সভায় যাইব।"

"হঁ্যা, কিন্তু এখন আমি আমার মতের পরিবর্ত্তন করেছি। লেডী ইসাবেল তবে এখন বিদায়।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র মিসেস্ ভেন পুনরায় বলে উঠিলেন, স্কুলের মেয়েদের মত এই সামান্য সরু হারটা বই তোমার আর কিছু নাই! তোমাকে এতে কি রকম দেখাবে?"

ইসাবেল বলিল, "ও মিসেস্ ভেন! বার বার ঐ কথা কেন বলচেন? আমি কেবল আমার ক্রুশ ভাঙ্গার কথাই ভাবছি। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে ইহা অবশ্য কোন বিপদের চিহ্ন।"

"বিপদ—কেন?"

"ইহা বিপদেরই চিহ্ন। মা মৃত্যুর সময় এইটী আমাকে দিয়া বলেছিলেন, ইহা ভৌতিক কবচের ন্যায়, এটীকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিও। যখন কোন অসুবিধায়

পড়িবে, কিম্বা পরামর্শের দরকার হইবে তখন এই ক্রুশটীর প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিও, এবং তাহার আদেশ যা হবে, সেই অনুসারে কায করিও। সেই ক্রুশটী আজ আমার ভাঙ্গিয়া গেল—হায় ভাঙ্গিয়া গেল!"

একটা গ্যাসের আলো গাড়ীর মধ্যে ইসাবেলের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। মিসেস্ ভেন বলিলেন, "তুমি আবার কাঁদিতেছ? ইসাবেল! আমি বলিতেছি তুমি যদি এরকম কর ত এই লাল চক্ষু সঙ্গে করে, ডার্টফোর্ড্সের ডাচেসের বাড়ীতে আমি যাব না। তুমি যদি কান্না থামাতে না পার, আমি গাড়ী ঘুরাইয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিব। ইচ্ছা কর তুমি একা যাইও।"

ইসাবেল আস্তে আস্তে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিতে বলিল "আমি এই ভাঙ্গা টুকরাগুল জুড়িয়া লইতে পারিব স্বীকার করি কিন্তু ইহা কিছুতেই আর আগেকার মত হইবে না।"

মিসেস্ ভেন ঘৃণার সহিত বলিলেন, "তুমি সে টুকরাগুলি কি করিলে?"

ইসাবেল তার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিল যে "ভাঙ্গা টুকরাগুলি আমাকে মিসেস্ লেভিসন দিয়েছিলেন, সেই গুলি পাতলা কাগজে মুড়ে আমার ফ্রকের ভিতরকার পকেটে রাখিয়াছি। আমার উপরের পকেট নাই।"

মিসেস্ ভেন তার এই কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "অতি শিশু-ভাবাপন্ন ও দুর্ব্বল হওয়া ভাল নয়। আমি কখন এরূপ ছিলাম না, দশবৎসর বয়স হইতেই আমি বেশ বড় হয়েছিলাম। তিনি অবজ্ঞার সহিত ইসাবেলের কথা পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, 'আমার ফ্রকের ভিতরের পকেটে রাখিয়াছি!' 'তোমার বয়স এখন আঠার বৎসর হইয়াছে তুমি এখনও 'ফ্রক' পর! আমি বলি তুমি যখন ধাত্রীর কাছ ছেড়েছিলে তখনই তোমার 'ফ্রক' ছাড়া উচিত ছিল।"

ইসাবেল তার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, "আমি পোষাকই বলেছি, বুঝে-ছিলাম।"

"মিসেস্ ভেন মনে মনে বলিলেন, তুমি হাবা মেয়ে তাই এরূপ বুঝিয়াছিলে!"

নবযৌবনের সজীবতায় পরিপূর্ণ প্রাণে দুঃখের কথা কি অধিক্ষণ স্থান পাইতে পারে? কিছুক্ষণ পরেই ইসাবেল সব দুঃখ ভুলে গেল। সভা গৃহের সাজসজ্জা ও উজ্জলতা তার মনে যেন স্বপ্নরাজ্যের মনোহর দৃশ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কারণ পল্লীগ্রামে বাস হেতু এই সকল স্থানের অভিজ্ঞতা তাহার আদৌ ছিল না। তাহার উপর তৎপ্রতি সভাগৃহের সমাগত লোকদিগের প্রশংসা বাক্য ও কথা বার্ত্তার মধ্যে সে তাহার ক্রুশ ভাঙ্গার কথা কি করিয়া মনে রাখিবে?

একজন অক্সফোর্ডের ছাত্র অদূরে প্রাচীরের অন্তরালে যে ব্যক্তি ছিল

তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল কিহে!" আমি বিবেচনা করি এই নৃত্য গৃহই জীবনের সর্ব্ব প্রধান পতনের স্থান।"

"আমি মনে করে ছিলাম তুমি এসব স্থানে আসা ছেড়ে দিয়েছ।" সেই ব্যক্তি উত্তর করিল "হাঁ। তাই দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কোন কিছু দেখবার জন্য পুনরায় এসেছি।"

"কি দেখবার জন্য এখানে এসেছেন?"

"একটী স্ত্রী। আমার অভিভাবক প্রতিজ্ঞা করেছেন আমি যদি আমার চরিত্র সংশোধন না করি এবং বিবাহ না করি তাহা হইলে এক পয়সাও আমাকে দিবেন না। কারণ আমি ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। সেই জন্য আমি এক স্ত্রী পছন্দ করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

"এই অভিনব সুন্দরীকে তুমি গ্রহণ কর না।"

"এ কে?"

"ইনি লেডী ইসাবেল ভেন।"

ঐ যুবক জমিদার বলিলেন, তোমার এই মত প্রকাশের জন্য আমি তোমার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু লোকে গণ্যমান্য শ্বশুর চায়। মাউণ্টসভারিন ও আমি দুই জনেই এক শ্রেণীর লোক। আমার বোধ হয় আমরা দুই জনেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হারাব।"

"দেখ এক সঙ্গে সব পাওয়া যায় না। ঐ মেয়েটী কিন্তু অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালী। হায়! আমি সেই হতভাগ্য চরিত্র হীন লেভিসনকে তার কাছে যাইতে দেখ্‌লাম। সে হতভাগ্য সুন্দরী পত্নী লাভের জন্য সব করিতে পারে।"

"হাঁ। সে এরকম করিতে পারে তা আমি বিশ্বাস করি।"

"আমি এই সকল লোককে ঘৃণা করি। হতভাগ্য কোঁকড়ান চুল, পরিষ্কার দাঁতও ধব্‌ধবে সুন্দর হাত নিয়ে মনে করে আমি বড় রূপবান। হতভাগা একটা পশুর মত হৃদয়হীন। কুমারী চাটারিসের কি হইল?"

"তা কে জানে? লেভিসনটাত তার ভিতর থেকে বাণ মাছের মত বেরিয়ে এল, এবং ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোকের উপরই সব দোষ পড়িল। পৃথিবীর তৃ-চতুর্থাংশ লোকে তাহাকে বিশ্বাস করে। এই যে সে এদিকে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে মাউণ্ট সভারিনের মেয়েও আছে।"

সেই মুহূর্ত্তে ফ্রান্সিস লেভিসন ও ইসাবেল তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। ক্যাপ্তেন তখন মৃদু মধুর স্বরে ইসাবেলের কর্ণে বচনামৃত বর্ষণ করিয়া বলিতেছিলেন 'আমার অনিচ্ছাকৃত এই ক্রুশ ভাঙ্গার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, আমার সমস্ত জীবনব্যাপী পূজা দ্বারাও ইহার পূরণ হইবে না।' কিন্তু হায় মুখ এত মধুর হইলে কি হইবে? তাহার হৃদয় অতি ভয়ঙ্কর পশুর সমান।"

লেডী ইসাবেল মুখ তুলিয়া তাহার

প্রতি চাহিয়া দেখিল, যুবক গভীর প্রেম পুরিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে; তাহার মুখ হইতে একটী বাক্যও নিঃসৃত হইল না। ভয়ানক লজ্জায় পুনরায় তার গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল, সে নীরবে আঁখি পল্লব নত করিল।

"সাবধান—সাবধান, তরুণী ইসাবেল! এই লোকটীকে বাহিরে যেমন সুন্দর দেখিতেছ ভিতরে এ তেমনি মহাপাপী পশু।" তাহারা অনুচ্চস্বরে তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় এই কথা বলিয়া গেল।

যুবক জমীদার বলিলেন, "আমি মনে করি ও একটা অতি নীচ হতভাগ্য লোক।"

"হাঁ আমিও ওকে সেই রকমই জানি, কেন না আমি জানি ও অনেক বার স্ত্রী লোক ঘটিত অতি গর্হিত কায করেছে, এবং অবশেষে সেই হতভাগিনীদের রসাতলে দিয়ে নিজে বীরদর্পে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওটা অতি হতভাগা। আহা ঐ মেয়েটী বাস্তবিকই বড় সুন্দরী।

একাদশী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশীর যতই মনে হইতে লাগিল ফ্লরিন সকলের নিকট হইতে পৃথক, অদৃষ্ট দেবতা তাহাকে সকলের সাহচর্য্য হইতে তফাৎ থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কড়াকড় হুকুম জারী করিয়া—অসহায় শিশুকে এমন ভাবে জব্দ করিতেছেন, —ততই ফ্লরিণের প্রতি তাহার সহানুভূতিতাহার আরও জাগিতে লাগিল। না না সে একলাই এই সব অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবে, একলাই সকল ক্ষতিপূরণ করিবে।

কিন্তু তাহার জেদের বাড়াবাড়ীতে আবার উল্টা উৎপত্তি হইয়া দাঁড়াইল, পরের ছেলেটীর শুভাশুভের চিন্তায় বাড়ীর সবাই অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন স্বয়ং সাহেব,—ফ্লরিণের অজ্ঞাতসারে—তাহাকে ডাকিয়া ফ্লরিণের রোগের সংক্রামকতা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। আপনার সন্তান হইলে কি হয়,—ক্লায়লিঠ সাহেব তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে অনুরোধ করিলেন, "সাবধান হতে পার ভাল না হয় তুমি ছুটী নিয়ে বাড়ী যাও বাছা।"

একাদশী সে কথার কোন জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সাহেবের কামরা হইতে বাহিরে আসিল। কুঠীর সামনে মাঠে ফ্লরিণ একলা ছুটাছুটী খেলিতেছিল, হঠাৎ ব্যগ্রভাবে একাদশী সেখানে আসিয়া আচম্কা তাহাকে

জড়াইয়া ধরিল।—"দাদা ফুরিণ ভাই আমার!"

একাদশী সবলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, তাহার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল, ফুরিণ অবাক্!

ফুরিণের কাছ হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইবে? কে লইতে পারে লউক। সে কিছুতেই ফুরিণকে তফাৎ করিবে না, ফুরিণ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহারই বা সুস্থ থাকিয়া লাভ কি? না সে অমন নির্দ্দয়ভাবে সুস্থ থাকার শাস্তি ভোগ করিতে পারিবে না কিছুতেই না!—

একাদশী দৃঢ়হস্তে ফুরিণকে জড়াইয়া ধরিল, যেন তখনই সত্য সত্যই কে ফুরিণকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্ত ছুটিয়া আসিতেছে!

রক্তের সম্পর্কই দুনীয়ায় সব চেয়ে বড় দাবী, তাহার কাছে মাথা গলাইবার অধিকার আর কাহারও নাই, কেউ যদি প্রসাদ ভিক্ষায় নতশিরে সেথানে আসিয়া দাঁড়ায়,—তবে অমনি চারিদিক হইতে হাজার জোড়া শাসনের রক্তবর্ণ চক্ষু, বজ্র দীপ্তিতে হুঙ্কার করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কি উৎপীড়ন! ওগো নিজের ছেলেকে সবাই ভালবাসে, তা বলিয়া পরের কি সেথানে আসিয়া দন্তস্ফূট করিবার ক্ষমতাটুকু দিতেও তোমরা কাতর!—অভিমানে ক্ষোভে একাদশী সোচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল।

(৩)

তাহার পর দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে, স্থান পরিবর্ত্তনের গুণে, প্রথম দিনকতক ফুরিণ একটু সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, ওজনেও বাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আবার অবস্থা মন্দ হইতে দেখা গেল। চিকিৎসকগণ উপর্য্যুপরি ঔষধ বদলাইতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতা মাতা হতাশার আকুলতা বুকে চাপিয়া গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত কাটাইতে লাগিলেন।

আর একাদশী!—চতুর্দ্দিক হইতে সেই সব অজানা আশঙ্কার অস্ফুট গুঞ্জন, সব বিষম ব্যাকুলতা,—তাহাকে যেন মুহুর্মুহু বিভীষিকার বেষ্টনীতে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল। সেই নিঃশব্দ ঘনীভূত উদ্বিগ্নতার মাঝে একাদশীর অধীর চিত্ত, শত উৎকণ্ঠার সহস্র হস্ত বিস্তার করিয়া, সেই জ্বর তপ্ত রুগ্ন শিশুকে আগ্‌লাইয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিবা সত্য সত্যই ছাড়াছাড়ি হয়?

আজ এক মাস শিশু শয্যাগত। তাহার উঠিবার শক্তি নাই, একাদশী ম্লান ছায়ার মত এক মাস অহোরাত্র তাহার সঙ্গী। সকলের বকাবকীর জন্ত স্নানাহার করিতে একবার করিয়া উঠে, আর রাত্রিতে যখন নিদ্রাভারে চক্ষু দুটো খুলিয়া রাখিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হইয়া যায়, তখন রোগীর শয্যাপ্রান্তে মাথা রাখিয়া সেই খানেই পড়িয়া একটু ঘুমায় মাত্র।

অবস্থা বুঝিয়া সাহেব তাহাকে নানা ছুতায় কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু তাহাকে নড়ায় কে? সাহেব মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া একাদশীকে জবাব দিলেন। একাদশী সাহেবের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্নিমেষ নয়নে শীর্ণাকৃতি পাণ্ডুর-কাপল, নিদ্রালস বালকের মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। নিজের ছেলেতো বাঁচিবেই না, কিন্তু তাঁহার ছেলের জন্য কি পরের ছেলেও মারা যাইবে? এ যে বড় মুস্কিল!

যত দিন যাইতে লাগিল, একাদশীর উদ্বেগ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একে একে সকল আলো নিবিয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ, তীরের বালী, বাগানের ফুল, মাঠের খেলা—সমস্ত লোভনীয় ব্যাপার গুলোই কোথায় কি নয়—ছয় হইয়া গোলমাল পাকাইয়া গেল! পেটের ক্ষুধা, চোখের ঘুমও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। রহিল শুধু সেই একাগ্র চিত্তে রোগীর সেবা, আর উৎকণ্ঠা ব্যাকুল মুখে, রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকা।

অষ্ট প্রহর রোগীর পাশে ভবিত হাওয়ায় আবদ্ধ একাদশীকে,—সাহেব, মেম দুজনে আসিয়া বলিলেন "যাও একাদশী, সমুদ্রের ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে এস, আমরা এখানে বসচি।"

একদশী উঠে না, সাহেব হাত ধরিয়া তুলিয়া ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, একাদশীর আতঙ্ক বাড়িয়া উঠিল, কোন রকমে পা পা করিয়া কুঠীর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া—তাহার পর সহসা ফিরিয়া,—ছুটিয়া গিয়া আবার ঘরে ঢুকিল —"দোহাই সাহেব, বাইরের হাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না, আমি ঘরে বেশ থাকব।"

(৪)

ফ্লুরিণ সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন, নির্ঝুম। তাহার মুখের রং দিন দিন অত্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া আসিতেছে, চামড়া ঠেলিয়া পাজরের হাড় গুলা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, গোলাপের রাশীকৃত পাপড়ীর মত কোমল—তাহার হাত দুখানি এমন শ্লথ ও শীর্ণ—অস্থি কঠিন হইয়াছে, অলস মুদ্রিত চোখে সর্ব্বদাই সে ডান পাশে শুইয়া আছে, কিন্তু ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যায়।

সে দিন আকাশে খুব মেঘ করিয়াছিল, কয়দিন হইতেই এমনি গুমট হইয়া আছে। সন্ধ্যার পর মেঘ আরো ঘনীভূত হইয়া, বিদ্যুৎ বর্ষণ করিতে করিতে, আকাশ ময় ছুটাছুটী করিয়া খেলিতে লাগিল, তার পর ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল, সকলে বুঝিল ঘূর্ণ বাত্যা।

জানালা সার্শি বন্ধ করিয়া, ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়া কাজ চলিতে লাগিল। বাহিরের ভীষণতায় ভীত, অভিভূত একাদশী, রোগার্ত্ত বালককে বুকে করিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল প্রাণে বসিয়া রহিল। ঝড় যত ঘুরিয়া, ঘুরিয়া ফুলিয়া, ফুলিয়া গোঁ গোঁ শব্দে হুঙ্কার করিয়া আসে, সেও তত

আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠে! কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকে, ঝড়ের আঘাতে জানালা দুয়ার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে, সমস্ত ঘর বাড়ী কাঁপিতে থাকে—আর একাদশী রোগাচ্ছন্ন বালককে দুই বাহুর নীচে আড়াল করিয়া ধরে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিটা,—একটা নিগূঢ় শয়তানীর 'দলা' আঁটিয়া মহা উল্লাস রোলে, তাহাদের দুটী প্রাণীকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে! চারিদিকেই যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, ওঃ কি বিভীষিকা!

হায়! ওগো কে কোথায় আছ, বলিয়া দাও, কি করিয়া সে এত বিঘ্ন হটাইয়া এই ছোট শিশুটীকে আপনার করিয়া রাখে! চারি দিকের এই সব বিশৃঙ্খলতার উদ্যোগ আয়োজন —প্রকৃতির এই করাল উন্মাদন-সঙ্গীত, এ যেন কেবলই এই নিঃস্ব দরিদ্রের বক্ষ হইতে এই ক্ষুদ্র কপর্দ্দক টুকু লুটিয়া লইবার উৎকট উৎসব রোল বলিয়া মনে হইতেছে! ওগো কে আছ শক্তিমান, সাহায্য কর, বাঁচাও, ওগো রক্ষা কর!

নিষ্পলক নেত্রে বালকের মুখপানে চাহিয়া, নিস্পন্দ নির্জ্জীবের মত একাদশী প্রলয়ঙ্কর উদ্বেগ বুকে লইয়া, সমান ভাবে বসিয়া রহিল।

(৫)

তিন দিন তিন রাত্রি আকাশের অবস্থা সেইরূপ থাকিয়া চতুর্থ দিনে ঝড় থামিল, মেঘ কাটিয়া গেল, পরিষ্কার সূর্য্য উঠিল। একাদশী মনের উৎকণ্ঠা ঝাড়িয়া স্ফূর্ত্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে বিপদ মুক্ত মনে করিয়া অত্যন্ত স্বস্তি লাভ করিল। হাল্কা বুকে, হাঁসি মুখে ঘর হইতে বাহির হইল। আঃ কি চমৎকার আজ চারিদিকের চেহারা! কি সুন্দর স্বচ্ছ শীতলোজ্জ্বল প্রভাত!

কিন্তু ঘরের ভিতর সে দিন একটু পরেই একটা সন্ত্রস্ত আতঙ্কের ছায়া আসিয়া পড়িল। এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টায় যোঝাযুঝি করিয়া যে শঙ্কা ব্যাকুল ভয়াবহ মুহূর্ত্তটি ক্রমাগত পিছাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া আসা হইতেছে, আজ বুঝি তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, আজ বুঝি সকল শক্তিকে জয় করিয়া সে সদম্ভে আবির্ভূত হয়!

রোগী আজ ক্রমশঃ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটী, যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া বারম্বার সে সতৃষ্ণ নয়নে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার দীপ্তি হীন ম্লান মুখের উপর একটা তীব্র অধিরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, রুগ্ন আজ বড় ছট্ ফট্ করিতেছে, তাহার অস্বস্তি আজ বড় বাড়িয়াছে, বড় বাড়িয়াছে—তাহাকে বুঝি আজ শান্ত করিতে পারা যায় না!

চিকিৎসক আসিলেন পরীক্ষা করিলেন, তার পর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। মর্ম্মপীড়িত পিতা

হাতের উপর হাত রাখিয়া, নৈরাশ্য কাতর যন্ত্রনা রঞ্জিত মুখে, নীরবে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মাতা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভ্রান্ত আশায় স্ফীত বুকে একাদশী বাগানের বেড়ার কাছে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিতেছে, এমন সময় দেখিল ছোট মেম সাহেব, বারেন্দায় টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতেছেন, আর পিতা হাতে মাথা রাখিয়া ভয়ানক নিস্তব্ধ হইয়া, নিকটে চেয়ারে বসিয়া আছেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে একাদশীর মাথা ঘুরিয়া গেল, একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা তীক্ষ শেলের মত অকস্মাৎ তাহার বুকে বিঁধিল, একাদশী ছুটিয়া আসিয়া ফ্লুরিণের ঘরে ঢুকিল।

একি চারি দিকেই, গভীর বিষাদময় হৃদয়ভেদী আতঙ্কের করাল ঢেউ! একাদশী কারো মুখপানে চাহিতে সাহস করিল না, কি জানি কি দেখিতে কি দেখিবে!

কঙ্কাল সার দেহে ফ্লুরিণ শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, একাদশী একেবারে গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—ফ্লুরিণ, ফ্লুরিণ, দাদা আমার”

মুহূর্ত্ত মধ্যে ফ্লুরিণ স্থির! কষ্টে ফিরিয়া একবার চাহিল, কিন্তু হায় চিনিতে পারিল না, আবার মুখ ফিরাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

উঃ এক ঘণ্টা হয় নাই, সে এ ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে একি ভয়ানক অবস্থান্তর! একাদশীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে শয্যার প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

যন্ত্রনাপীড়িত বিকৃত স্বরে ফ্লুরিণ ডাকিল “ম—”

“কেন ফ্লুরিণ কি বলছ?” মা মুখের কাছে সরিয়া আসিলেন।

“একদশী কই মা?”

“দাদা ভাই কোথা আমার! এই যে আমি!”—একাদশী মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে আর কি!—পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল।

ফ্লুরিণের যন্ত্রনা-স্তিমিত মুখে একটু ম্লান হাঁসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! এইবার সে চিনিয়াছে!—“মা আমার পিস্তল,—সেই পিস্তল, ঐ আলমারীতে আছে মা, একটী বার দাও!”

মা চোখ মুছিতে মুছিতে পিস্তল আনিয়া দিলেন, শ্লথ দুর্ব্বল হাতে ফ্লুরিণ সেটাকে একবার তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না হাত কাঁপিতে লাগিল, ক্লান্ত ভাবে ডাকিল —“একাদশী, একাদশী!”

উচ্ছসিত কাতরতায় ব্যাকুল একাদশী বলিল কি হয়েছে ফ্লুরিণ,—কি কষ্ট হচ্ছে বল না ভাই”

“বুঝ্‌তে পারছি না একাদশী, বুঝ্‌তে পারছি না, কিন্তু—বড় যাতনা!—” ফ্লুরিণের চোখ দিয়া দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল, একাদশী আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল!

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দু একটি কথা।*

মানব শিশু জ্ঞানের অঙ্কুর লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, শিক্ষা প্রভাবেই তাহার চিত্তবৃত্তি সমূহ বিকশিত হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। শিক্ষার প্রভাবে মানবের সহজাত স্থূল স্থূল জ্ঞান গুলির ধীরে ধীরে বিকাশ হয় বটে কিন্তু তাহার পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব।

বন্য অসভ্য জাতীয় মনুষ্যেরা স্বভাবের নিয়মে যে জ্ঞান লাভ করে তাহা তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। আদিম বন্য জাতীয় লোকেরা যখন অগ্নি উৎপাদন করিতে ও অগ্নির ব্যবহার করিতে শিখে নাই তখন তাহারা কাঁচা মাংস ভোজন করিত, অস্থি ও প্রস্তর ঘর্ষণ দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্র করিয়া অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। সেই অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় স্বরূপ মৃগয়া দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতে তাহাদের কত শ্রম ও আয়াস স্বীকার এবং কত সময় ব্যয় করিতে হইত তাহা এখনকার দিনে সকলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা তখন সেই অস্ত্রকেই অপরিবর্ত্তনীয় অত্যুৎকৃষ্ট ও চরম উন্নত অস্ত্র বলিয়াই নিশ্চয় বিশ্বাস করিত। কালে ইহাপেক্ষা উন্নততর অস্ত্রের ধারণা হইলে তাহারা নিজেদের অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ ও সুবিধাজনক বলিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এই যে অভাব টুকু বোধ করা ইহাই উন্নতি বা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবার প্রথম লক্ষণ, আর হয় ত শিক্ষার চেষ্টার আরম্ভও এখান হইতেই। বর্ত্তমান কালে জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের হীনতা বোধ কি আমাদের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিবে না?

দুইটি সমবয়স্ক বন্য অসভ্য শিশুর একটির লালন পালন ও শিক্ষার ভার যদি কোন সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে দেওয়া যায়, ও অপরটি যদি তাহার বন্য জননীর নিকট পালিত ও শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের প্রদত্ত ও প্রাপ্ত শিক্ষার ফল যে কিরূপ বিভিন্ন হয় তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। জ্ঞান ও রুচিভেদে শিক্ষার তারতম্য এখানেই নির্ণীত হইবে। বন্য অসভ্য মনুষ্যের আহারান্বেষণ, আহার, নিদ্রা, সন্তানোৎপাদন ও সন্তান পালন, এবং আবশ্যক হইলে আত্মরক্ষা, ইহাই তাহার সহজাত জ্ঞানের চরম পরিণতি। ইহার কোন একটির অভাব না হইলেই সে সুখী ও সন্তুষ্ট। ইহা অপেক্ষা আর কিছু চিন্তার বিষয় থাকিতে পারে তাহা তাহার জ্ঞানের অগোচর। তাহার চিন্তার সমষ্টি এই কয়টি ব্যাপারেই নিবদ্ধ।

* কৃষ্ণনগর মহিলা সমিতিতে পঠিত।

ঐ অসভ্য মনুষ্যের সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কার্য্যের বিভাগ যাহা দেখা গেল তাহা ত ইতর প্রাণীগণেরও আছে। তবে ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? শিক্ষা ও তজ্জাত জ্ঞানই এই প্রভেদ—এই বিভিন্নতা।

শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হইয়া অনুশীলন দ্বারা তাহা পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষার ফল যে শুধু চরিত্রের বিকাশেই শেষ হয় তাহা নহে, মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতা বিধানেও শিক্ষার ফল বিশেষরূপে কার্য্যকরী। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও চক্ষুর উপর রহিয়াছে। এই যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক পাখা, মোটরকার এত আরাম ও আনন্দ প্রদান করিতেছে। এই যে গ্রামোফোন্ কতই চিত্ত বিনোদন করিতেছে। এই যে ফটোগ্রাফ, প্রিয় বিচ্ছেদ যাতনা লঘুতর করিতেছে। আর কত নাম করিব? ইহার সকলই শিক্ষা ও তাহার অনুশীলনের ফল। জ্ঞানের দ্বারা অভাব বোধ করা ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা অভাব মোচন করা, ইহাই শিক্ষার পরিণতি।

শিক্ষা নরনারী উভয়ের জীবনেই অন্নজলের মত আবশ্যক। নরনারী এক পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং জ্ঞান লাভে অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা উভয়েরই সমান। ঈশ্বর নারী জাতিকে জ্ঞান লাভের অনুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—নারীর বুদ্ধি বৃত্তি বা মস্তিষ্কের গঠনের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য আছে—এমন কথা আজ পর্য্যন্ত ত কেহ স্বীকার করেন নাই। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে নারী এই ভারতে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, তপস্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমকক্ষ ছিলেন তাহার প্রমাণ এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশ্ববারা নাম্নী মহিলা ঋক্ বেদের কয়েকটি সুক্ত রচনা করেন, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি প্রাচীন ভারত-নারীগণ দর্শন শাস্ত্রে কিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, তাহা বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত যুগেও অতুলনীয়। এ সমস্তই শিক্ষার ফল। শিক্ষা ও তলব্ধ জ্ঞানের জন্যই এই সব মহিলা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া স্মরণীয়া ও বরনীয়া হইয়া রহিয়াছেন। নারী দুর্ব্বলা ও অধীনা, আবহমানকাল পুরুষের স্বার্থপ্রণোদিত ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। নারী ইচ্ছা করিলে আত্মচেষ্টায় শিক্ষা ও জ্ঞানালোক দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জড়তা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, জ্ঞানদীপ্ত, পবিত্র, সংযত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া আপনার গৌরব-মণ্ডিত আসন অধিকতর উজ্জ্বল করিতে পারেন।

৺স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়া গিয়াছেন শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আর আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, আর আমাদের নিকট তিনি ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্চেন। নিউ ইয়র্কে আমি নিঃসম্বল, বিগতশ্রী, দরিদ্র, মহামূর্খ,—আইরিস কলোনিষ্ট (Irish Colonist) আসিতেছে দেখিতাম। সম্বল এক লাঠি ও তাহার

অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী—তার চলন সভয়, চাউনী সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়েছে—তার বেশ ভূষা বদলে গেছে—তার চাউনীতে আর চলনে সে ভয় ভাব নাই। কেন এমন হল? তার স্বদেশে সে চারদিকে ঘৃণার মধ্যে ছিল—সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে বলছিল "Pat তোর আশা নাই, তুই যেমন নীচ হয়ে জন্মেছিস তেমনি থাক্‌বি" আজন্ম এই কথা শুনতে শুনতে Pat এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপ্নটাইজ (Hypnotize) কর্‌লে যে সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর অমেরিকায় (America) আসিবা মাত্র চারদিক থেকে ধ্বনি উঠিল "Pat তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ—মানুষেই ত সব কায করছে—তোর আমার মত, মানুষ সব করতে পারে," Pat ঘাড় তুল্লে, দেখলে ঠিক কথাই ত—তার ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

এই উক্তি এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অনেক শক্তি ও জ্ঞানের অঙ্কুর নিহিত আছে, প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। উপযুক্ত রূপ যত্ন, স্থান ও কাল পাইলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের নারীরা শক্তি বিকাশের স্থান, কাল, যত্ন পাওয়া দূরে থাক, আরও বিকাশের প্রতিকূল অবস্থা পাইয়া, বিরুদ্ধ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাদের সংস্কার এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাহা ঠিক্ ঐ Irishman Pat এর অনুরূপ। তাই "নারীর শিক্ষার আবশ্যক নাই" এই কথা নারীর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। বহুকালের কুসংস্কারার্জ্জিত এই ধারণা দূর করিতে অনেক চেষ্টা ও উজ্জ্বল আদর্শের আবশ্যক। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য তাই গার্গী, মৈত্রেয়ী, উভ ভারতী, খনা, লীলা, হঠি বিদ্যালঙ্কার, চন্দ্রমুখী প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন ও আধুনিক বিদুষী মহিলাগণের জন্মভূমিতে স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতার জন্য বলিতে হয়।

মানব দেহের অর্দ্ধাংশ যদি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া শুষ্ক, অসাড়, অবশ হয়, তবে সেই শরীরে আরামের সম্ভাবনা কোথায়—কিরূপেই বা সম্পূর্ণরূপ সুশৃঙ্খলায় কায চলিতে পারে? একখানি দ্বিচক্র শকটের একটি চক্র যদি জীর্ণ কিম্বা ভগ্ন হয় তবে তদ্দ্বারা সুন্দর রূপে কার্য্য নির্ব্বাহের আশা করা যাইতে পারে কি? বাইবেলে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আদি পুরুষের দেহের একাংশ হইতে আদি নারীর সৃষ্টি করেন। অনেক দেশে অনেক শাস্ত্রেই নারী পুরুষের অর্দ্ধাংশ ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এক অংশের যদি শিক্ষা ও জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে তবে অপর অংশের কেন থাকিবেনা ইহা বুদ্ধির অগম্য। পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহাংশকে বহন করিয়া সুস্থ অংশ কিরূপে আরাম পাইতে পারে ও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইতে

পারে। অশিক্ষিতা স্ত্রী ও শিক্ষিত পুরুষের পক্ষে কতকটা পক্ষাঘাত গ্রস্ত অঙ্গের ন্যায়। দীর্ঘকালের অভ্যাসে রুগ্ন অশক্ত অঙ্গ বহন করা অভ্যস্ত হইলেও নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ, আনন্দ ও শান্তির আশা করা বাতুলতা। চিররুগ্ন ব্যক্তি চিরাভ্যস্ত রোগ যন্ত্রনা সহিয়া যেমন দৈনিক কর্ত্তব্য কোন প্রকারে সম্পন্ন করে, আমাদের পুরুষদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। স্বাস্থ সুখের স্বাদ পাইলে, তখন রুগ্ন অবস্থার যন্ত্রণারূপ পূর্ণ হীনতার বিষয় উপলব্ধি হইবে। আমাদের দেশের নারীরা উচ্চ আশার স্বাদ প্রাপ্ত হন নাই, উচ্চ আদর্শ ও তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর, সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। উচ্চ শিক্ষিত পুরুষের সহধর্ম্মিনী সহযোগিনী হওয়া দূরে থাক্ আমাদের মহিলারা কোনও উচ্চ বা সৎ বিষয়ের আলোচনায় স্বামীর তৃপ্তি বা আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন? শিক্ষিত স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট আসিবেন তখন তাঁহার উচ্চভাব, চিন্তা যা' কিছু বাহিরে রাখিয়া স্ত্রীর উপযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হইল, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নয়। ইহাতে স্বামীর তৃপ্তি ও আনন্দ কেমন অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা সহজেই অনুমেয়। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যঙ্গ কবিতা আছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।

নারীর দায়িত্বপূর্ণ জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষার আবশ্যকতা বিদ্যমান। আদর্শ মাতা, আদর্শ পত্নী ও সুগৃহিণী হওয়া সকলই শিক্ষা সাপেক্ষ। সন্তান পালন, সন্তানের চরিত্র গঠন, নীতি শিক্ষা, এগুলি সুমাতার হস্তে হইলে যেরূপ সুফল প্রদান করে, অন্যথা সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। শিশু সন্তানের উপর মাতার প্রভাব অপরিমেয়। শিশুর কোমল হৃদয়ে মাতার প্রদত্ত শিক্ষা চিরজীবনের জন্য খোদিত হইয়া থাকে। সুমাতার সুশিক্ষায় শিশুর চরিত্রের ভিত্তি কেমন সুন্দর ও দৃঢ়রূপে গঠিত হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। যে অশিক্ষিতা জননীর নিজের চিত্ত অনুদার ও অগঠিত, তিনি কিরূপে শিশুর চরিত্র গঠনের সহায়তা করিতে পারেন? যে সকল মহাত্মা চরিত্রের বলে পৃথিবীতে যশস্বী ও পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র অধিকাংশ স্থলে বাল্যকালে তাঁহাদের মাতা কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। জননীর স্তনদুগ্ধ যেমন শিশুর শরীরে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি গঠন করে, তেমনি জননীর প্রকৃতি ও সংস্কার অলক্ষে শিশুর মনকে গঠিত করিতে থাকে।

সুগৃহিণী হইতে হইলে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, সেবা, নিঃস্বার্থতা, সমদর্শীতা প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণের আবশ্যক, সুশিক্ষার দ্বারা তাহা অধিকতর উজ্জ্বল ও সহজ হয়। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা গৃহিণীর এই সকল সদ্গুণের অভাবে একদিনও তিষ্ঠিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সদ্বৃত্তি অনুশীলনের ক্ষেত্র স্বরূপ এই প্রাচীন প্রথা, দেশ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমাদের অধুনিক গৃহিণীরা প্রাচীনাদের সদ্‌গুণাবলী ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, এবং নবতর শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা চরিত্র গঠন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার দৃষ্টান্তের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত করিতেছেন।

প্রাচীনা গৃহিণীরা লিখন, পঠনাদি শিক্ষা বর্জ্জিতা হইয়া যে উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, নবীনা গৃহিণীরা তাহা পারেন কই? সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেও না হয় সাংসারিক দিক দিয়াও শিক্ষার অনাবশ্যকতা স্বীকার করা যাইত। তাঁহারা দয়ার, সেবার, ক্ষমার, সহিষ্ণুতার ও সহৃদয়তার যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহার কোন্‌টা অনুসৃত হইতেছে? তাঁহারা বহুপরিবারেরর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির শাশুড়ী, ননদ, জা, পুত্রবধূ, দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া প্রভৃতি "পাঁচজনে" পরিবেষ্টিতা হইয়া বাস করিতেন, ও বিভিন্ন প্রকৃতির সংঘর্ষ হাসি-মুখে সহ্য করিয়া তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে আত্মনিয়োগ করিয়া আন্তরিক সুখ লাভ করিতেন। তাঁহারা দরিদ্র ও রুগ্ন প্রতিবেশীর সাহায্য ও সেবা করিয়া, শোকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া কত ভাবে লোকের দুঃখ মোচন করিয়া সুখলাভ করিতেন। তাঁহারা সময় মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, সময় নষ্ট করা পাপ বলিয়া জানিতেন, তাই অবসর সময়ে তখনকার প্রচলিত শিল্পচর্চ্চা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ এবং অসুবিধা দূর করিতেন। তাঁহাদের কালে অসার উপন্যাসাদির অস্তিত্ব ছিল না, তাঁহারা অবকাশকালে শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহাতে বর্ণিত সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আদর্শ চরিত্র হইতে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতেন এবং ঐ সকল আদর্শ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া ধন্য হইতেন। সংসারের প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল—তাঁহারা সংসারের সকল বিষয়েই নিজের বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া শৃঙ্খলা ও শান্তিবিধান করিতেন। তাঁহারা রোগে শোকে এত অধীর হইতেন না। তাঁহারা কত দ্রব্যগুণ, উদ্ভিদের গুণ অবগত ছিলেন এবং নিজ পরিবারের মধ্যে সামান্য রোগ উহা দ্বারাই আরোগ্য করিতেন। এগুলি কি শিক্ষণীয় নহে? এক্ষণে নবীনাদের মধ্যে কয়জন এই গুণগুলির অধিকারিনী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন?

কাল পরিবর্ত্তনশীল—দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষার পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী। লিখন পঠনাক্ষমা হইয়া সে কালের গৃহিণীরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, এ কালে তদ্রূপ গুণ ও শক্তির অধিকারিণী হইয়াও লেখা পড়া না জানাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা নিশ্চিত। সে কালে ডাক-বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না। তখনকার কালে ছ'মাস ন'মাস অন্তর কাহারও

পিত্রালয় হইতে মিষ্টান্নবাহী ভৃত্যের হস্তে একখানি পত্র আসিত এবং সেই সংবাদে তৃপ্ত হইয়াই দীর্ঘকাল কাটাইতে হইত। তত্ত্ব অর্থাৎ সংবাদ গ্রহণ করা হইত বলিয়াই অদ্যাবধি মিষ্টান্নাদি উপহার প্রেরণ করা "তত্ত্ব" নামে অভিহিত হইয়াছে। এখনকার কালে দীর্ঘকাল এইরূপ সংবাদ না পাইয়া কেহ তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? সে কালে প্রবাসী স্বামী প্রবাসে বৎসর কাটাইয়া পূজার অবকাশে বৎসরান্তে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতেন। তখন প্রবাসে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়ার রীতি ছিল না, বরং লজ্জাকর ও নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার কালে সে কালের সেই রীতির সমর্থন কেহ করিতে পারিবেন কি? আমরা কোন কোন প্রাচীনার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কর্মস্থলে যাইবার সুযোগ পাওয়া ও অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পরিবার বর্গের প্রতি কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া স্বার্থপরতা মনে করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন, নিজের সুখের চেয়ে—এমন কি স্বামীর চেয়েও স্বামীর কর্ত্তব্যকে গুরুতর মনে করিতেন। আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি?

এদেশে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির ও যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতর রত্ন স্বরূপ, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জননী অশিক্ষিতা, তবে তাঁহারা কিরূপে শিক্ষা লাভ করিলেন এ প্রশ্ন সহজেই হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা অর্থ মূলক, জ্ঞান মূলক নহে। বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে তাহার "চাকরী" মিলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, এই জন্যই মাতা কিম্বা অভিভাবকেরা বালকের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত যত্ন ও তাড়না করেন। অর্থোপার্জ্জনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ না থাকিলে বোধহয় বালকদের শিক্ষাও বালিকাদের শিক্ষার অনুরূপ হইত। যে কারণেই হউক বালকদের শিক্ষার জন্য যে যত্ন করা হয় ইহা সৌভাগ্যের বিষয়! অশিক্ষিতা মাতার শিক্ষানুরাগ সন্তানের জ্ঞান লাভের জন্য না হইয়া অর্থোপার্জ্জনের পন্থা সুগম করিতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। যদি বি, এ, কিম্বা এম্, এ, উপাধিধারী না হইলেও ডেপুটী, মুন্সেফ কিম্বা ঐরূপ উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হইবার নিয়ম এখন গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত করেন তাহা হইলে বালকদের উচ্চশিক্ষা দিবার আগ্রহ ও উৎসাহ কতটা স্থায়ী হয় তাহা বোঝা যায়। যেটুকু শিখিলে চাকরী লাভ সহজ হইবে সেই টুকুই যুবকেরা শেখে এবং যতদিন না তাহা হয় ততদিন তাহাদের শিক্ষার জন্য যত্ন করা হইয়া থাকে। তাহার পর উপাধি লাভ হইলে অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যায়। উপাধি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সকল উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য

প্রশংসা কাহার প্রাপ্য—অশিক্ষিতা জননীর কিম্বা চাকরাণীর? এ বিষয় বিচার যোগ্য।

বালিকাদের শিক্ষা দিবার প্রতিদানে যদি এইরূপ লাভ বা স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সকল অশিক্ষিতা মাতাই বালিকাদের শিক্ষার জন্য উৎসাহের সহিত একান্ত চেষ্টা করিতেন। বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে লাভ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে দেশ, সমাজ ও জাতিগত লাভ আছে। এই লাভের সম্ভাবনাটুকু অশিক্ষিতা মাতাদের বোঝান দুরূহ। ইহা বুঝিতে হইলে শিক্ষা ও মার্জ্জিত মনের আবশ্যক। আর এই জন্যই ভবিষ্যৎ জননী বালিকাদের শিক্ষার আবশ্যকতা।

স্ত্রীশিক্ষা ভারতে নূতন আমদানী নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই একান্ত আবশ্যক জ্ঞান ভারতে নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। মনুর বচন :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

অন্যত্র—

"নারীহি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ। তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারী শিক্ষা গরীয়সী।" ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে জানা যায় স্ত্রীশিক্ষা অশেষ কল্যাণ ও গৌরবজনক, একান্ত অপরিহার্য্য জ্ঞান প্রাচীকালে অতি শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। নারীই পুরুষের জননী—যে নারী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা সেই নারী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলে যে ক্ষতি তাহা শুধু নারীরই একা নহে পুরুষেরও।

নরনারীর কর্ত্তব্য ও কার্য্যক্ষেত্রের বিভিন্নতায় নারীর শিক্ষার একটু বিভিন্নতা আবশ্যক হইতে পারে। মূলতঃ জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা উভয়েরই সমান আবশ্যক। জননী, পত্নী ও গৃহিণীর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক অন্ততঃ পক্ষে সেই টুকু প্রথমে হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে আর যত হয় ততই লাভ। মূর্খ স্বার্থপর ও কুটিল স্বভাব স্ত্রীর সংসর্গে কত বিদ্বান পুরুষ অপদার্থ হইয়া গিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পুরুষের উপর স্ত্রীর এই প্রভাব যদি সুশিক্ষা মার্জ্জিত ও কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত হইয়া হইত তবে অনেক সংসার শান্তির আগার হইত। ইংরেজ কবি মিল্টন্ লিখিয়াছেন "স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য গৃহকার্য্যে ও স্বামীকে সাধুপথে স্থিরভাবে রক্ষণে প্রকৃতপক্ষে লক্ষিত হয়।" কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাচ্ছলে লিখিয়াছেন যে "স্ত্রী সময়ে চৈতন্য প্রদান, সময়ে সান্ত্বনা প্রদান, সময়ে আদেশ প্রদান করিতে সক্ষম, সেই স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ। উন্মত্ত পুরুষকে সচেতন, শোক সন্তপ্ত পুরুষকে শান্ত, দুর্দ্দান্ত পুরুষকে আজ্ঞাধীন করাই স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ।" কিন্তু এই সকল শক্তির অধিকারিণী হওয়া শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর হয় কি?

বিধাতা নারী হৃদয়ে স্বাভাবিক যে কোমলতা দিয়াছেন, সেই কোমল প্রকৃতির শিক্ষা দ্বারা উৎকর্ষ সাধন করিয়া, কোমল মধুর হৃদয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেন ও জগতে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য বিস্তার করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীচারুমতি দেবী।

ভুত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

চন্দনী আপনার কক্ষে বসিয়া বসিয়াই সমস্ত দিন যাপন করিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি একটীবার ভ্রমণে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু অপরিচিত প্রহরীগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল।

চন্দনী ইহার অর্থ কিছুই উপলব্ধি করিতে সমর্থা হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কারণ কি ?"

তাহারা বলিল "কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম নাই।"

চন্দনী "আমার উপরেও কি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে" এই বলিয়া মনে মনে কহিলেন "হাঁ আমার উপর ত সন্দেহ হইতেই পারে, আমিত এতকাল তাঁহার শত্রুই ছিলাম এই অল্পকাল হইল মিত্র হইয়াছি। হায়! আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। চন্দনী আর বহির্গমনের চেষ্টা না করিয়া আপনার একটী নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। রজনী প্রভাত হইয়া গেল, উষা সমাগমে সুন্দরী সররুহের ন্যায় চন্দনী দেবীরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চন্দনী শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি অসমর্থা হইলেন, কারণ বহু চেষ্টাতেও কক্ষের দ্বার মুক্ত করিতে পারিলেন না। কক্ষের যত দ্বার ছিল সমুদয় গুলি বাহির হইতে বদ্ধ রহিয়াছে। চন্দনীর দ্বার খুলিবার জন্য যত চেষ্টা, সমুদয় ব্যর্থ হইল। জানালাগুলিও বদ্ধ। ক্রমশ যত বেলা হইতে লাগিল চন্দনীর অধৈর্য্যও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন পরিচারিকা কর্ত্তৃক একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথ দিয়া চন্দনীর আহার্য্য আনিত হইল।

চন্দনী পরিচারিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনই তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, কিন্তু অনুমানে বুঝিলেন তিনি বন্দিনী হইয়াছেন। অপরাপর পুরাতন ভৃত্যগণ তাড়িত হইল আর তিনি বন্দিনী হইলেন। গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিলে মাতার সহিত একত্র হইয়া অনর্থ ঘটাইব এই ভাবিয়া চণ্ডদেব আমাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে না দিয়া বন্দিনী

করিয়া রাখিল। চন্দনী ভাবিলেন ভালই হইল তথাপি মাতার সন্নিকটে রহিব।

চন্দনী সেই কক্ষের মধ্যেই স্নান করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন এবং স্নানাহার পরিসমাপ্তির পর কক্ষমধ্যে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

দিন আসে, দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায় এইভাবে দশ পনর দিবস গত হইল।

একদিন গভীর রাত্রিতে চন্দনী অনিদ্রা অবস্থায় গুণগুণ করিয়া এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন:—

(১)

এস প্রিয়তম মমহৃদি কুঞ্জাগারে—
(অন্তরের মধ্যস্থলে এ নিভৃত স্থান)
অশরীরি হয়ে মানবের অগোচরে
চিরানন্দে করিব মিলন-সুধাপান।

(২)

গুপ্ত মন-রাজ্য মাঝে প্রেম হ্রদ-নীরে
ডুবিব মৃণাল হয়ে ভাবের কর্দ্দমে
সরসিজ মাঝে সখা তিষ্ঠ তদুপরে
নাহি হেথা বাধা বিঘ্ন স্পর্শ আলাপনে।

(৩)

কখনো মানস-রাজ্যে পূত প্রেমাশ্রমে
উপবিষ্ট রব দোঁহে পরিয়া বল্কল
(উচ্ছ্বসিত হবে হিয়া আনন্দ প্লাবনে)
তৃণ-বৎ তুচ্ছ করি পাপ ধরাতল।

(৪)

কভু বা মানস-রাজ্যে প্রেম-কুঞ্জবনে
(একটী বরষ যথা একটি পলক)
জগতের অগোচরে সদা সঙ্গোপনে
হেরিব দোঁহারে দোঁহে আঁখি অপলক।

(৫)

কখনও মানস-পটে রহিব চিত্রিত
নব শঙ্খ নবাশাড়ী করি পরিধান
শরৎ ঋতুর রাঙ্গা প্রভাতের মত
হেরিব বঙ্কিম নেত্রে বঁধুর বয়ান।

(৬)

কখনও মানসাকাশে সুখের সমিরে
ভাসি বেড়াইব দোঁহে পরীর মতন
লজ্জা ঘৃণা ভয় ভীতি রবেনা শরীরে
আত্মার মিলন এ যে পবিত্র মিলন।

(৭)

এসহে মানস-রাজ্যে মানস-মোহন!
প্রেম-পারিজাত-ফুলে মহামূল্য হার
গাঁথিয়া পূজিব পদ কেন অকারণ
শারীরিক মিলনেতে পাপের সঞ্চার।

(৮)

করিব অসার দেহ অসার জগৎ
পুণ্যে পরমায়ু বৃদ্ধি পুণ্য স্বর্গ সম
মানসে করিব ভোগ সখা মনোমত
এস হৃদি পুষ্প-বনে এস প্রিয়তম।

(৯)

অশরীরী হয়ে এস সুরভীর মত
জোৎস্নার ন্যায় এসে কর আলিঙ্গন
বায়ুরূপে স্পর্শ সুখ ভুঞ্জিব নিয়ত
শব্দরূপে কর্ণপথে কর পরশন।

(১০)

সম্পূর্ণ হৃদয় মন, সর্ব্বস্ব আমার
মানসে হইবে আজ মধুর মিলন

বিরহের মহাভয় রহিবে না আর
ভুঞ্জিব তাবং সুখ যাবং জীবন।

চন্দনী এইরূপে কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন আর চক্ষুজলে তাঁহার গণ্ড স্থল প্লাবিত হইতেছিল। হঠাৎ কি একটি শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিতলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শব্দটি ক্রন্দনের, তাহাও আবার একটি স্ত্রীলোকের বলিয়া অনুভব হইল।

এ স্বর তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ অপরিচিতা এ বাড়ীতে কোথা হইতে আসিল? কে বা আনিল? নিশান্তে আর কোন শব্দাদি তাঁহার কর্ণে আসিল না, কিন্তু গভীর নিশাকালে পুনরায় তাঁহার পার্শ্বের ঘর হইতেই ক্রন্দনের শব্দ তাঁহার কর্ণে আসিতে লাগিল। অন্ধকার ক্রন্দন ধ্বনি বহুক্ষণব্যাপী ও করুণ। চন্দনী সাবধানে শুনিতে লাগিলেন। অস্ত তাঁহার বোধ হইতে লাগিল এ স্বর যেন তাঁহার পরিচিত। তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না, হাঁ, এইবার যেন বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন এ যে প্রতিধ্বনির স্বর। প্রতিধ্বনি তুমি! প্রতিধ্বনি! তুমি কি এখনও জীবিতা আছ? দেবদত্ত! দেবদত্ত! নন্দক! নন্দক! কোথায় তোমরা?—

ক্রমশঃ

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা
ঢাকা
বখ্‌সিবাজার।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ষষ্ঠ মহাধিবেশন।

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত হিন্দুগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, হিন্দুজাতির অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ষষ্ঠ মহাধিবেশন আগামী শীতকালে বড়দিনের সময় ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকাশীধামে সম্পাদিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই বিরাট ধর্ম্মসভার পাঁচটি মহাধিবেশন সমারোহের সহিত মথুরা, দিল্লী, প্রয়াগ, কাশী ও কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং সকল স্থানেই ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ও সভ্যগণ সমবেত হইয়া বিদ্যা, ধর্ম্ম, সমাজাদি বিবিধ বিষয়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও পুরুষার্থের পবিত্র শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। আবার অতীতের অনন্ত বিপত্তিময় অমানিশা কাটাইয়া ভবিষ্যতের গৌরব-রবিকে আবাহন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমহামণ্ডলের দ্বারা এই মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতেছে।

অতএব এই বিরাট সভার আহ্বান ধ্বনি প্রত্যেক সহৃদয় হিন্দুর হৃদয়ে কি

প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করিবে না? প্রত্যেক ধার্ম্মিক হিন্দুর এখন কর্ত্তব্য এই যে যাহাতে এই মহাধিবেশন পূর্ব্বের মহাধিবেশন গুলির অপেক্ষা আরও সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয় এবং ইহাতে বিবেচিত বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সমাজ আদি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়গ্রাহী ও অনুমোদিত হয় সেই বিষয়ে সকলেই যথাসাধ্য প্রযত্ন করেন, এবং সকলের সমবেত শক্তির দিব্যফলে যে হিন্দুর জাতীয় জীবনকে অধিকতর উন্নতির সোপানে আরোহন করাইবে ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারেনা।

ত্রিগুণময়ী মায়ার পরিণামশীল প্রবাহে সংসারে নিত্যই নূতন পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে এবং হিন্দুজাতির জীবনও বর্ত্তমান কালের স্রোতে এক নবীন দশা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব এই সময়ে ভারতের সকল সম্প্রদায় ও মতাবলম্বী ধার্ম্মিক হিন্দুগণের একান্ত কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সকলে কোন এক পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত হইয়া হিন্দু জাতির ধর্ম্ম জীবন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সুবিচার ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন, যাহাতে জাতীয় জীবন প্রবাহিনী কল্যাণবহা হইয়া প্রাচীন মহর্ষিগণের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করত সকল জীবের কল্যান সাধন করিতে পারে। এই সকল মহদুদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্যই শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের, প্রস্তাবিত মহাধিবেশনের আয়োজন করা হইতেছে।

এতদতিরিক্ত এই মহাধিবেশনের দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কিরূপে ভবিষ্যতের উন্নতিময় জীবনে পদার্পণ করিল তাহাই সূচিত হইবে। এই ত্রয়োদশ বৎসরের বিপত্তিময় কঠিন জীবন অতিবাহিত করিয়াও ভারতে ধর্ম্মের অভ্যুন্নতির জন্য শ্রীমহামণ্ডল অনেক কার্য্য করিয়াছে যথা—(১) সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণকে সঙ্ঘশক্তির ভুবন বিজয়িনী পতাকার নীচে একত্রিত করিয়াছে। (২) ভারতের সমস্ত প্রান্তীয় স্বাধীন নরপতি, ধনবান ও শক্তিশালী রাজাগণ, ধর্ম্মের প্রতি আস্থাসম্পন্ন নেতা ও সভামণ্ডলী এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে সনাতন ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে উত্তেজিত ও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। (৩) উত্তরভারতের ক্ষত্রিয়গণের সহিত রাজপুতানার ক্ষত্রিয়গণের সামাজিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছে। (৪) শত শত ধার্ম্মিক বক্তা ও উপদেষ্টা দ্বারা, গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ও পুস্তিকা সমূহের দ্বারা এবং ইংরাজী ও প্রান্তীয় বিবিধ ভাষায় পত্রিকা প্রণয়ন দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছে। (৫) ভারতকে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন করিয়া প্রত্যেক প্রান্তে প্রান্তীয় মণ্ডল স্থাপন ও তদন্তর্গত শত শত সভা স্থাপন করিয়াছে এবং ধর্ম্মসভা, প্রান্তীয় মণ্ডল ও মহামণ্ডলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

একতা স্থাপন করত নিয়মবদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুশাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। (৬) সাধু ও গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তা প্রস্তুত করিবার জন্য কাশীপুরীতে একটি আদর্শ উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। (৭) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় বিদ্যাপীঠ সমূহের উদ্ধার সাধন এবং জোশিমঠের উদ্ধার সাধন কল্পে অনেক পুরুষার্থ করিয়াছে। (৮) যোগ্য ব্যক্তিকে উপাধি ও মানপত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান এবং বিবিধ বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত উত্তেজনা প্রদান করিয়াছে। (৯) সনাতন ধর্ম্মের উদার স্বরূপ জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করত সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিহার করাইয়াছে। (১০) অনেক লুপ্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। (১১) ধার্ম্মিক স্ত্রী শিক্ষার প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছে। এবং (১২) রাজভক্তির প্রচার করিয়া রাজা প্রজা সম্বন্ধকে বদ্ধমূল করিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ধর্ম্মকার্য্য মহামণ্ডলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে—যাহার উপকারিতা ও জাতীয় ধর্ম্ম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুদ্ধিমান্ পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় প্রারম্ভিক অনেক বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করিয়া এখন শ্রীমহামণ্ডল হিন্দুজাতির স্থায়ী কল্যানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষণ দ্বারা এই বিশাল কল্পতরু নষ্ট না হইয়া বরঞ্চ আরও দৃঢ়মূল হইয়াছে। ইহার স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতিকে ভবিষ্যৎ বাধাহীন করিবার জন্য মহামণ্ডল ট্রষ্টের স্থাপনা করা হইয়াছে এবং বারাণসীর একটি বিশেষ মনোরম স্থানে প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য বিশাল বাটী ক্রয় করা হইয়াছে। কার্য্যাবলীর দৈনন্দিন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জমি ক্রয় করত নূতন বাটী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, এবং আর্থিক অবস্থারও অনেক সচ্ছলতা হইয়াছে। এখন ভগবানের কৃপায় সকল দিকে সুবিধা হওয়াতে প্রস্তাবিত মহাধিবেশনের উদ্যোগ করা হইতেছে।

মহামণ্ডলের নিয়ম অনুসারে মহাধিবেশন ধার্ম্মিক হিন্দু প্রজার একটী মহান্ সম্মিলন, পরন্তু এবারে এই মহাসম্মিলনের ধর্ম্মভাবের গভীরতার বিশেষ বৃদ্ধি সাধনের জন্য মহাধিবেশনের সময়ে একটী মহা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করা হইবে। ইহাতে রাজা, প্রজা, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, বিদ্বান্, কর্ম্মকাণ্ডী আদি সকলেই যোগদান করিবেন। ইহার ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির সমবেত প্রার্থনা শক্তিদ্বারা সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বদিন বিশেষ ধুমধামের সহিত নগরসংকীর্ত্তন ও বেদ ভগবানের শোভাযাত্রা (procession) কাশীনগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবে।

এই বিশাল সমারোহে ভারতে অনেক ধার্ম্মিক নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ যোগদান করিবেন।

গুণপূজা ও যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার দ্বারাই প্রত্যেক জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই জন্য এই মহাধিবেশনে সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ভারতে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রচার, সাহিত্য, পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শিতা, শিল্পকলার নৈপুণ্য, সাধারণের কল্যাণকর ধর্ম্মকার্য্য, কর্ম্মকাণ্ডে যোগ্যতা, অপূর্ব্ব দানশীলতা আদি বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে এই মহাসভা হইতে উক্ত মহাধিবেশনের সময় উপাধি, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক, মানপত্র, ধন্যবাদপত্র আদি দ্বারা ভূষিত করা হইবে। এপর্য্যন্ত শ্রীমহামণ্ডল হইতে ২৩ জনকে ধর্ম্মোপাধি, ৪১ জনকে বিদ্যোপাধি, ৭ জনকে পদার্থ-বিদ্যোপাধি, ৫ জনকে মহামহোপদেশক পদবী, ২৯ জনকে মহোপদেশক পদবী ৪৪ জনকে উপদেশক পদবী, ২৬ জনকে মানপত্র, ১৬ জনকে পদক ও মানপত্র, ৫১ জনকে ধন্যবাদ পত্র এবং ১৪ জন নরপতি ও ধর্ম্মাচার্য্যকে সংরক্ষক মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

এই মহাধিবেশনে ভারতের সকল প্রান্ত হইতেই বিদ্বান, সুপণ্ডিত, নেতৃবর্গ ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের শুভাগমন হইবে। এইজন্য মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ মনস্থ করিয়াছেন যে এই শুভ অবসরে সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পে বর্ত্তমান সামাজিক, জাতীয় এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারণীয় বিষয়ের উপর সকলে একত্রিত হইয়া বিচার করা হয় এবং এইরূপে শাস্ত্রানুমোদিত সার্ব্বজনিক সিদ্ধান্ত সকলের সম্মুখে প্রকটন করা হয়, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ সামাজিক বিষয়ে মতদ্বৈধতা নিবন্ধন যে নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিদূরিত হইয়া জাতীয় জীবনের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। সকল বিষয়ই অন্তরঙ্গ কমিটিতে প্রথম বিচারিত হইয়া পরে সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিচার ও মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়।

স্কুল ও কলেজে ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার, সাধু ও গৃহস্থ প্রচারক প্রস্তুত, সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও প্রচারকদিগের সহায়তা প্রদান, শান্তি ও আস্তিকতা নাশকারী বাহ্য অহিন্দুভাব সকলের দূরীকরণ, উত্তম কথা, কীর্ত্তন, যাত্রা আদিদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার, পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী ঋষিকুল আদি সংস্থাপন দ্বারা আর্য্য-বিদ্যার বিস্তার, প্রাচীন-বিদ্যা পীঠ সমূহ এবং জোশিমঠের উদ্ধার, হিন্দুগৃহে সতী-ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা এবং বর্ত্তমান বিজাতীয় বিরুদ্ধ সংস্কার সমূহের নিরাকরণ ইত্যাদি।

সামাজিক বিষয়।

বিবাহে অতিরিক্ত পণ গ্রহণ, ও শ্রাদ্ধাদিতে অন্যায় বয়াধিক্য, ধর্ম্মার্থ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি ও দানের সদ্ব্যবস্থা তীর্থস্থানে মন্দির, কুণ্ড, সরোবর, ঘাট আদির সদ্ব্যবস্থা, মন্দিরের পুরোহিত ও পাণ্ডাগণের উন্নতি, সাধু ও ব্রাহ্মণগণের উন্নতি সাধন, বিধবা ও অনাথগণের প্রতিপালন, সামাজিক অনুশাসন ব্যবস্থা, পঞ্চায়তি ব্যবস্থার প্রচার, সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর বিচার যাহাতে শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতাযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয় সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। এইরূপ জাতীয় বিরাট সম্মিলনে হিন্দু মাত্রেরই যোগদান করা উচিত। ধার্ম্মিক একতা ও সঙ্ঘ শক্তির অভাবে হিন্দুজাতি দিন দিন অবনতির অন্ধকারময় কূপে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। যত ভিন্নতা জনিত অন্তর্বিবাদ এই অনাদি আর্য্যজাতিকে কীটদষ্ট তরুর ন্যায় দিন দিন নিঃসার করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্য শ্রীমহামণ্ডলের এই জাতীয় মহাযজ্ঞে আমরা আদরের সহিত সমস্ত হিন্দুকে আহবান করিতেছি। আশা করি প্রত্যেক হিন্দুই এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়া হিন্দুজাতির কল্যান সাধন করিবেন।

উৎসবের মনোহারিতা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় একটি সুন্দর প্রদর্শনীর (exhibition) ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রতাপ সিংহ মেজর জেনেরেল
জি, সি, এস, আই, জি, সি, আই, ই,
মহারাজা জম্বু ও কাশ্মীর
সভাপতি ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি সভা।
রামেশ্বর সিংহ কে, সি, আই, ই,
মহারাজা গিধোর সভাপতি প্রবন্ধ
কারিণীসভা।
সারদাচরণ মিত্র।
ভূতপূর্ব্ব জজ্ কলিকাতা
হাইকোর্ট প্রধান মন্ত্রী।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল
প্রধান কার্য্যালয় জগৎগঞ্জ
বেনারস ছাউনি।
১লা নবেম্বর ১৯১৫।

সংবাদ।

(১)

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে ভারত সচিব এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের নিমিত্ত বাৎসরিক ৩০০০ ৲ টাকার একটী বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। বৃত্তি প্রাপ্ত মহিলা গ্রাজুয়েট হওয়া আবশ্যক।

নোট—মহাধিবেশন সম্বন্ধীয় পত্র ব্যবহার করিতে বা কোন সংবাদ জানিতে হইলে সেক্রেটরী মহাধিবেশন বিভাগ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

তাহাকে গ্রেটব্রিটেনের কোন স্থানে বা অনুমতি লইয়া অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অপর শাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত ও এই বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারিবে।

(২)

মান্দ্রাজ প্রদেশে ভিজিয়ানাগ্রামে অন্ধ বালিকাদিগের এক সম্মিলনীতে বালিকাদিগের শারীরিক ব্যায়ামের আবশ্যকতা আলোচিত হইয়াছে। সম্মিলনীর নায়িকা শ্রীমতী সূর্য্য অম্মা খেলার উপকারিতা বর্ণনা করিয়া বালিকাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত খেলায় যোগদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্ধবালিকারা স্থির করিয়াছে যে তাহারা মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিধান করিবে না এবং তাহাদের সকল সাজ সজ্জা স্বদেশী হইবে।

(৩)

অনাথা বিধবাগণ যাহাতে শিল্পকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য বিহারের পাটনা নগরে বরোদার মহারাণী যশোদয়াণ নামে এক শিল্প ভবনের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(৪)

অষ্ট্রেলিয়ার ম্যালেসাইল নামক একজন বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের চেষ্টা করিতেছেন। নিউসাউথওয়েলসের গবর্ণমেণ্ট এই কৃত্রিম বৃষ্টি সংক্রান্ত পরীক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ম্যালেসাইল বলেন ছয় সাত হাজার ফিট উপরে বেলুনে উঠিয়া উহার সাহায্যে বায়ুস্তরে তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োগ করিবেন। ইহার ফলে বায়ুতে যে আর্দ্রতার সঞ্চার হইবে তদ্বারা বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘরাশিতে পরিণত হইয়া বারি বর্ষণ করিবে। বৈজ্ঞানিক বলেন, বায়ু প্রবাহের পথে এই প্রকারের কয়েকটা আড্ডা স্থাপন করিতে পারিলে কৃত্রিম উপায়ে বারিবর্ষণের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

(৫)

এবার বড়দিনের সময় বোম্বাই নগরে বাণিজ্য সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহাতে বোম্বাইয়ের বণিক সমাজের অন্যতম উদ্যোগী মাননীয় স্যার ফজলর ভাই করিম ভাই সভাপতি হইবেন এবং শ্রীযুক্ত ওয়াচা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৬)

বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের কন্যাগণ ও রাজ পরিবারস্থ কুমারীগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বেঙ্গল এম্বুলেন্স দলের ছেলেদের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা ও তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন। মহারাজা বাহাদুরের কন্যাগণের এই উদারতা অতি মহৎ আদর্শস্থল।

(৭)

আমরা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ভারত হিতৈষি স্যার ফেরোজ শা মেটা ও ভারত বন্ধু স্যার হেনরী কটন্ আর ইহলোকে নাই।

এই দুই ভারত হিতৈষির তিরোভাবে সমগ্র দেশবাসী ব্যথিত হইয়াছে।

( )

ইন্দোরের সহৃদয়া মহারাণী ইন্দিরাবাই বোলকার দেওয়ালি উপলক্ষে বোম্বায়ের লর্ড হার্ডিঞ্জ হাসপাতালের আহত সৈনিকগণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নানাবিধ সুভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

আজি হেন শুভদিনে
কে আছে বিষণ্ণ মনে
আনন্দে ভাসিছে সবে এ বঙ্গ আগারে।
ভগিনী ভ্রাতার ভালে
ফোঁটা দেয় কুতুহলে
এত সুখ আর কোথা আছে এ সংসারে।
ভ্রাতারে ভগিনী যত
সাজায় যে মনমত
কত যে আশীষ মাগে বিভুর চরণে।
ভগিনী ভ্রাতার তরে
কত যে যতন করে
প্রকাশে সে ভালবাসা যত ছিল মনে।
হেন পুণ্যময় দৃশ্য
খুঁজিলে না পাবে বিশ্ব
ভগিনী ভ্রাতার এই মধুর মিলন।
কোথা কি দেখেছ কেহ
হেন ভাই বোন স্নেহ
এ বঙ্গ সংসারে বিনা মিলে না কখন।
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
কি স্নেহ বিরাজ করে
দেখায় জগত জনে আজি এ মরতে।
কর বিধি আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হোক এই সাধ
এই দৃশ্য চিরদিন থাকে এ ভারতে।
যেন শেষে কাল ফলে
ডুবে না অতল জলে
বাঙ্গালীর সব সুখ ডুবেছে যে মতে।

মৃন্ময়ী দেবী

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 628. December, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৮ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩২২। ডিসেম্বর, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাক্ ওসব কথা, আপনার কাছে একটা বিশেষ আবশ্যক আছে, তাই শ্রীচরণে নিবেদন করতেই আসা ;—

তর্ক। আর গৌরচন্দ্রিকা কেন? সোজা বল্ না কি বল্‌বি?

আমি ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, "বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' পড়েছেন তো? আপনার সে সকল বিষয়ে কি মত?

তর্ক। তুই কি, তা বল্ দেখি?

আ। আজ্ঞে সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

তর্ক। সে আবার কি?

আ। আমি যে কি, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাবা বলতেন গাধা, মা বলতেন হতভাগা, মেজদি বলেন সোনা, সত্যবাবু বলেন ষ্টুপিড্, সরলা বলে দাদা, শ্বশুর বলেন বাবাজী, তাঁর মেয়ে বলে ওগো, চাকর বলে বাবু, চাকরাণী বলে দাদাবাবু, হিমী বলে মামা বাবু, লোকে বলে ডাক্তার বাবু, ঠান্‌দিদিরা বলেন শালা, আপনি বলেন পাগল —ইত্যাদি। সে কথা যাক্। এখন এ বিষয়ে কি মত বলুন।

তর্ক। দূর গর্দ্দভ! ওসব কথা তোর মুখে কেন? তুই কি একটা বিধবা বিয়ে করবি নাকি?

আ। যদি করি? আপনি মত দেবেন?

তর্ক। বালাই? বিধবা বিয়ে করতে কেন যাবি? মেয়ের অভাব কি? কত

সব থাসা থাসা—বলিতে বলিতে হঠাৎ দম্ খাইয়া ঢোক গিলিলেন—"তা—তা—তা—তোর শ্বশুর আমার শিষ্য—

আ। নইলে বুঝি এর উপর আমায় আর একটা গছাতেন?

তর্ক। না—না,—বলি ওসব কথা কেন?

আ। সত্য বলব?

তর্ক। কি? ব্যাপারটা কি? ওসব কথা মুখে আন্‌তে আছে? মহাপাপ—মহাপাপ!!

আমি কি করিয়া কথা পাড়িব ভাবিয়া পাইলাম না। ব্যবসাদারী কথা বড় শিখিতে পারি নাই। সোজাসুজি সব বলিয়া ফেলিলাম, কাল সকালে মেজদিদির বাড়ী সভা হবে এবং চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ গণ্যমান্য অনেকের উপস্থিতিতে এবিষয়ে বিচার হবে. কিন্তু আপনার অনুপস্থিতে এ সকল কিছুই হতে পারে না, এজন্য সত্যেনবাবুর আপনার শ্রীচরণে সবিনয় প্রার্থনা যে, আপনি উপস্থিত থাকেন, ইত্যাদি সবই বলিলাম। ঠাকুরদাদা প্রথমে আমায় খানিক গালিগালাজ করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। সত্যেন্দ্রবাবু মাতব্বর যজমান,—অবশ্য মেজদির কল্যাণে,—নহিলে এত দিনে মিষ্টার ডাট্ ব্যাপ্‌টাইজ হইতেন।

বেলা আদৌ নাই দেখিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখি, একটি ভদ্রলোক গ্রামান্তর হইতে চাকর পাঠাইয়াছেন, লোকটা অনেকক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছে,—তাঁর ভ্রাতৃবধূর কলেরা। তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া ঔষধের বাক্স চাকরটির মাথায় দিয়া, অশ্বসজ্জিত করিয়া রওনা হইলাম।

(৫)

আমার স্বর্গীয়া জননী মৃত্যুশয্যায় আমায় বলিয়া গিয়াছেন, "গ্রামে কাহারো কাছে টাকা লইয়ো না;" কিন্তু গ্রামান্তর হইতেই মাসিক যাহা পাইতেছি তাহার দশমাংশও যদি পিতার আয় থাকিত তবে আমাদের জীবন-কাহিনী আর রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন হইত না; কিন্তু তাহা ছিল না। এ দুঃখময় জগতে কয়জন এমন আছেন, যাঁহার অন্তত একদিনও মনে করিতে হয় নাই—"হায়, এমনটি না হইয়া যদি এমনটি হইত, তবে আমি আজ কত সুখী হইতাম।" কিন্তু তাহা হইলে বৈষম্যময় জগৎ চলে কৈ? ঐ টুকুই তো দুনিয়ার দুনিয়াত্ব!

মেডিকেল্ কলেজের পাশকরা ডাক্তার আমি ছাড়া নিকটে আর কেহ ছিল না; সুতরাং ব্যবসা আরম্ভ করিতেই আমি "বড় ডাক্তার" নামে অভিহিত হইয়াছি। চারিদিকে অনেক সহস্র-মারী ছড়ানো ছিল, তাদেরই একজন এই রোগিনীকে প্রথমে চিকিৎসা করে, এবং কাজ গুছাইয়া তুলিয়া তবে আমায় 'কন্‌সাল্ট্' করিতে চাহে। গিয়া দেখি অধিক বিলম্ব নাই—সাত আট ঘণ্টা পূর্ব্বেও যদি আমায় ডাকিত, তথাপি নয় যমরাজের

সঙ্গে কিছুক্ষণ বোঝাপড়া করিয়া দেখিতাম। গ্রামের বাহিরে আমার অদৃষ্টে প্রায় এইরূপই হইত। দৃষ্টিকৃপণেরা রোগীকে না নামাইয়া প্রায়ই আমায় ডাকিত না; এই দৃষ্টিকৃপণতার জন্য যে কত নিরীহ জীব প্রাণ হারায়, তাহার সংখ্যা নাই। শেষে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না—অথচ তাহা নিষ্ফল হয়। কিন্তু প্রথমে পঞ্চাশটি টাকাও ব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবে। সে যাক্। তথাপি ঔষধ দিলাম, উপকারের মধ্যে হইল—আমার কিছু পাপসঞ্চয় এবং রোগিনীর মৃত্যু-যন্ত্রণার বৃদ্ধি। একটা কথা আছে "যমে মানুষে টানা,"—কথাটা বড় সত্য। ইহাতে উপকারের মধ্যে অনেক সময়ে এই হয় যে, জীবনীশক্তিকে অতি কষ্ট পাইয়া বাহির হইতে হয়। হয় তো কেহ বিষপান করিয়া সংজ্ঞাহারাইয়াছে, কিছুক্ষণ পরেই সব যন্ত্রণার হাত এড়াইবে; এমন সময় আমরা গিয়া ঔষধ প্রয়োগে তাহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলাম; আরো পাঁচ সাত ঘণ্টা বাঁচাইয়া রাখিলাম—শেষে রণে ভঙ্গ দিলাম—রোগীও মরিল, লাভের মধ্যে এই বাড়তি কষ্টটুকু ভোগ করিয়া গেল। বলে "বাঘে বাঘে লড়াই হয়, কর্যাড় বনের প্রাণটি যায়।" আমাদেরও যমে ডাক্তারে লড়াই হয়, মরিতে রোগীরই হয়; এখানেও তাহাই হইল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চেষ্টা করিলাম, শেষ রাত্রে রণে ভঙ্গ দিলাম।—বৃন্তচ্যুত রক্তোৎপলকে জলের ছিটা দিয়া কতক্ষণ রাখিব? রোগিনীকে ঘরের বাহির করা হইল, আমিও বাহিরে আসিলাম। তখন ভোরের পাখীরা অনেকক্ষণ হইতে চাঁচামিচি আরম্ভ করিয়াছে। যে বাড়ীতে গিয়াছিলাম তাহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তাহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য মধুমক্ষিকা আসিয়া জুটিয়াছে; একটা অবিশ্রান্ত ঝন্—ন্—ন—ন্—শব্দ উঠিতেছে,—যেন সেই আদি প্রণব ঝঙ্কারের জের চলিয়াছে। আমারও সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতেছিল, সুরে সুর মিলিল। এমন সময় দেখিলাম, মৃতা ষোড়শীর স্বামী বাহিরে আসিলেন—ইঁহাকে আমি চিনিতাম—এম্-এ পাশ করিয়া ইনি কলিকাতায় আইন পড়িতেছেন। ইঁহার সঙ্গে কলিকাতায় অনেক ফুটবলের ম্যাচ খেলিয়াছি, তবে ছেলেবেলায় তত পরিচয় ছিল না। ইঁহাদের অবস্থা ভাল, প্রায় আমারই বয়স।

তাঁহার স্ত্রীকে মৃত্যুশয্যায় দেখিয়াছি, সুস্থ অবস্থায় তাহার যে কি ছিল তাহা ভাবিয়াই পাইলাম না। বাহিরে আসিবার সময় আসন্নমৃতা রোগিনীর মুখ দেখিয়াছি, আর এই সুস্থ মানুষের মুখ দেখিলাম—প্রভেদ অল্পই। সেরূপ বিকৃত মুখশ্রী জীবন্ত মানুষের খুব কমই দেখিয়াছি।—যুবকের সে মুখের দিকে চাহিতে ভয় হয়।

ডাক্তারী করিতে বসিয়াছি, আমাদের

সম্মুখে এ সকল দৃশ্য নিত্য, তথাপি যেন আমি বিচলিত হইলাম। তাঁহার বাবা অর্থাৎ গৃহস্বামী, আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিতে এলেন, করজোড়ে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম—লইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি অনেক অনুরোধ করিলেন, তথাপি লইতে পারিলাম না। মনে হইল, পূর্ব্বজন্মে বুঝি এমনি কোনো ফুল কুসুমের প্রতি অবিচার করিয়াছিলাম, তাই এজন্মে—

বাড়ী ফিরিলাম। তখন বেশ বেলা হইয়াছে। সরলা স্নান করিতে গিয়াছে। পদ্মমুখী অবশ্য তখনো শয্যাত্যাগ করেন নাই ; আমায় দেখিয়া, আড়ামোড়া খাইয়া হাই তুলিয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা দিয়েছে ?" আমি আদ্যোপান্ত সব বলিলাম। এই সুখময় সংসারের কণ্টক স্বরূপ একটি সুন্দরী রমণী পৃথিবী ছাড়িয়াছে, শুনিয়া অবশ্য পদ্মমুখী মনে মনে খুসী হইলেন, তথাপি তাঁর মুখপদ্ম একটু বিরক্তির ভাব ধারণ করিল। তিনি বলিলেন, "বাবা রোগী দেখতে গিয়ে যদি দেখেন, রোগী মরিয়াছে, তবু ভিজিট্ ছাড়েন না।" গরিবের ছেলে, অর্থের মর্ম্ম বুঝি না বলিয়া বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলাম। জামাতার সুখের জন্য সকলে কন্যার বিবাহ দেয় না, তবে কন্যার সুখের জন্য জামাতার যে সকল সুখ আবশ্যক, তাহা অবশ্য বাঞ্ছনীয় বটে। যথা, জামাই দরিদ্র হইলে কন্যা বড়মানুষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জামাতা অসুন্দর, দুর্ব্বল, রূঢ়ভাষী অথবা অধার্ম্মিক হইলে কন্যার সুখ হওয়া অসম্ভব, অতএব এগুলির বিপরীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জামাতার সুখ গৌণ, আর কন্যার সুখ মুখ্য,—এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পদ্মমুখীর মুখের দিকে তাকাইয়াই আমায় ডাক্তারী পড়ানো ; অতএব আমি বেয়াকুবী করিয়া অর্থোপার্জ্জনে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে পদ্মমুখীর আমাকে তিরস্কার করিবার অধিকার আছে।

স্নান করিয়া আসিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইলাম, কিছু খাবার ও এক গ্লাস জল মিলিল। পদ্মমুখীর তখনো স্নান বা কাপড় ছাড়া হয় নাই। আত্নরীই এ সকল আনিয়া দিল। কম্পিতস্বরে একটু চিনি বা খানকয়েক বাতাসা প্রার্থনা করিলাম, এমন সময় সরলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "দাদা, খাবার পেয়েছ ? কৈ সরবৎ খাওনি ?" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সিরাপ আনিতে গেল। পদ্মমুখী বলিলেন, "স্পষ্ট বল্লেই হতো যে সরবৎ চাই, আমি কি করে' জানব ? আমি তো দেবতা নই। তা কেন ? নিজের সুন্দুরী বোন হাতে করে' না দিলে মন উঠবে কেন ?" এমন সময় সরলা সিরাপের বোতল আনিয়া দিল, সিরাপ না দিলেও চলিত ;—সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর রক্তবর্ণ চক্ষু হইতে একবিন্দু উষ্ণাশ্রু তাহাতে পড়িয়াছিল। তোমরা

জিজ্ঞাসা করিবে অশ্রু কেন? সে কথাটা আমিও চক্ষুকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। সদুত্তর পাই না।

রাত্রিতে ঘুমাই নাই, ঘুম আসিতেছিল কিন্তু জানিতেছি মেজদিদির বাড়ী এতক্ষণে আসর জমিয়াছে, সে জন্য ঘোর উৎকণ্ঠা রহিয়াছে। সরলা পান আনিয়া দিল, একটা চুরুট লইব বলিয়া ঘরের ভিতর গেলাম, দেখি, তথায় পদ্মমুখী বসিয়া পাখার বাতাস খাইতেছেন, মুখ ভারী, ক্ষমা চাহিলাম, আরো জ্বলিয়া উঠিলেন। ভয়ে চলিয়া আসিলাম।

(৬)

মেজদিদির বাড়ী গিয়া দেখি সকলেই উপস্থিত, কেবল তর্করত্ন মহাশয়ের জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। অনেক গুলি ভদ্র সন্তান সমবেত হইয়াছেন, তার মধ্যে নব্যের সংখ্যাই অধিক। বৈঠকখানার বারান্দায় সকলে ফরাসে বসিয়াছেন, ভিতরে মেজদিদি ও গ্রামের আর কয়েকটি শিক্ষিতা রমণী সোৎসুক চিত্তে বসিয়া চিকের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। মেজদিদি আমায় বলিলেন, "তুই একবার দেখে আয় না, ঠাকুরদাদা মহাশয় কেন আস্‌ছেন না।" তৎক্ষণাৎ সত্যবাবুর বাইসিকেল লইয়া সন্ সন্ করিয়া চলিলাম।

তথায় পৌঁছিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম মেজ-ঠান্‌দিদি পূজার ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছেন, ঠাকুরদাদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি অনেকক্ষণ গিয়াছেন। বুঝিলাম তবে আর কাহারো বাড়ীতে হয় তো অপেক্ষা করিতেছেন, অবিলম্বেই মেজদিদির বাড়ীতে যাইবেন। অগত্যা ফিরিলাম, এমন সময় দেখি ছোটঠান্‌দিদি স্নানান্তে আলুলায়িতকেশে উঠানের একধারে দাঁড়াইয়া একটু অঙ্গ দোলাইয়া একখানি শুষ্ক তোয়ালের এক অংশ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনিতে জড়াইয়া, প্রাণপণ শক্তিতে কানের পিঠ রগড়াইতেছেন। মুখখানির উপরেও সম্প্রতি ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। আমি বেশ পদশব্দ করিয়াই গিয়াছি, তাহা শুনিতে পাওয়াই উচিত ছিল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া, কর্ত্তব্য বোধেই, একবার কাশিলাম। তখন তিনি আমার দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া জিব কাটিলেন, এবং বস্ত্রাদি সংযত করিয়া ঘোম্‌টা দিলেন। অতঃপর আমার চোখের দিকে আর একবার তাকাইয়া ঘরের ভিতর গেলেন।

এমন সময় মেজ ঠান্‌দিদি তাঁহার সেই স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিলেন, "পেরফুল্লো, বেলের সরবৎ খাবি?" হাতে স্বর্গ পাইলাম। সমস্ত রাত্রি প্রায় অনাহারে কাটিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া শ্রীমতী পদ্মমুখী দাসী (!) র বরাদ্দ দেড় আনার রসগোল্লায় ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। সরলা সাহস করিয়া মধ্যস্থতা করে না, আমি তো জড়ভরত আছিই—যেদিকে ফিরাও

তুমি, সেই দিকে ফিরি আমি—নীরবে নিঃশব্দে দিন কাটিতেছে। সে যাহু! মহা আগ্রহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম এবং উদরে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। ছটি পাথর বাটি পূরিয়া সরবৎ পান করিলাম, এবং কিছু দমে-ভারী অর্থাৎ solid খাদ্য প্রার্থনা করায়, নটবর ময়রার দোকানের তিন ছটাক আন্দাজ কাঁচা গোল্লা পাইলাম—পোয়াবারো। অতি কৃতজ্ঞতার সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে সেগুলির সদ্গতি করিয়া, একটি দেড় হাত লম্বা ঢেকুর তুলিয়া জীবাত্মার পরিতৃপ্তির সংবাদ বহির্জগৎকে জ্ঞাপন করিলাম। চাকরকে আমার উচ্ছিষ্ট রেকাব ইত্যাদি ধুইবার হুকুম করিয়া বাহিরে আসিলাম।

(৭)

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আসর জমাট্। দূর হইতেই তর্করত্ন মহাশয়ের শিখাস্ফালন, হস্ত সঞ্চালন, এবং মুহুর্মুহু তর্জ্জন গর্জ্জন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু "অভাগা যেদিকে চায়, সমুদ্র শুকায়ে যায়"; আমিও উপস্থিত, তর্করত্ন মহাশয়েরও পালা শেষ। এবার চন্দ্রনাথ বাবুর পালা আসিল। ছেলে বেলায় যাত্রা শুনিতে গিয়া, যাত্রার যে অংশে ভীম অর্জ্জুন জাতীয় অভিনেতাদিগের বীর-রসের "অ্যাক্ট্" হইত, এবং অনতিবিলম্বে অরেণ্য ক্লথের মধ্যে নারিকেলের ছোব্‌ড়া-ভরা গদা এবং দুই দিকে সমান ধারওয়ালা তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ হইত, সেই সময়টা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুমাইয়া পড়িতাম, তবে 'বিফলে জনম গেল' মনে হইত। এখানেও আমার তাহাই হইল। তথাপি মতি রায়ের নারদাভিনয়ের ন্যায় নবীন দুইটি এম-এর তর্ক বিতর্ক শুনিতেই বাধ্য হইলাম।

সত্যেন্দ্রনাথ কায়স্থ, এজন্য গ্রামান্তরের আমার এবং তাঁহার বন্ধু একজন সংস্কৃত কলেজের এম-এ ব্রাহ্মণ-যুবক আমাদের হইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত তর্ক করিতে রাজী হইয়াছিলেন। তাঁর নাম হরিদাস। এতক্ষণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহারই কথা হইয়াছে। শুনিলাম তর্করত্নের তরফ হইতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর মূর্খ এবং নিষ্ঠুর;—"বিধবা বিবাহ" নামক পুস্তক লেখাই তাহার প্রমাণ। অপিচ তিনি সমাজের পরম শত্রু, "বহুবিবাহ" নামক পুস্তক লেখা তাহার জলন্ত প্রমাণ। পরন্তু, এই অচল অটল, অনাদিমধ্যান্তকমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুত হিন্দু সমাজের মধ্যে সংস্কার করিবার কিছুই থাকিতে পারে না ও নাই।—কাহারো ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবারও অধিকার নাই। তর্করত্ন মহাশয় নাকি, বজ্রগম্ভীর স্বরে এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছেন। শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিচারের এই সিদ্ধান্তের পরে, যুক্তি কি বলে তাহা দেখিলেও মহাপাতক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই স্থির হওয়ায়, বর্ত্তমান বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল।

হরিদাসবাবু চন্দ্রনাথবাবুকে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন বিধবা-বিবাহ

প্রচলিত হ'লে সমাজের কি অনিষ্ট হতে পারে আপনি মনে করেন? অবশ্য শাস্ত্রাদি যে সমাজ রক্ষারই জন্ম, একথা অস্বীকার ক'রে কোনো লাভ নেই। এবং আমাদের শাস্ত্রাদিরও এমন উদ্দেশ্য নয় যে বিনা-যুক্তিতে তা গ্রহণ করতে হবে। এখন গোলমাল—বর্ত্তমান সমাজ সমস্যা নিয়ে, কি বলেন?

চন্দ্র। দেখ ভায়া, বুড়ো হয়েছি, সমাজের যে সকল রেগুলেশনের মধ্যে এতদিন কাটালুম, তার একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ দেখলেই যেন গা কেমন করে ওঠে। শাস্ত্র ফাস্ত্র অত আর তখন বিচার তর্ক করতে ভাল লাগে না। আর যতদূর বুঝেছি, তাতে তোমাদের গতিক দেখে বোধ হয়, আজ না হোক কাল, কাল না হোক দশ বিশ বৎসর পরেও তোমরা অনেক ওলট-পালট করবেই করবে। তবে কি জান, আমাদের ও-সবের মধ্যে জড়িয়ো না। এসব স্থলে আমাদের emotion prevails over reason. এই জন্যেই দেখ না এ সকল প্রসঙ্গ উঠলেই তখনি খবরের কাগজে কাটা কাটা বোল দিয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠাই?

হরি। আজ্ঞে তাতো দেখি. আবার আপনার লেখার মধ্যে শ্লেষ বিদ্রূপের এমনি বাঁধুনি যে, সে সকল যখন পড়ি, তখন সত্যই মনের ভাব বদলে যায়, তখন আর 'সংস্কার' কথাটা মুখে আনতেও লজ্জা করে। আবার স্থির হয়ে চিন্তা করলেই দেখতে পাই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় এই সমাজের কতক গুলি নির্ম্মম প্রথার পরিবর্ত্তন না করতে পারলে, আমাদের অধঃপতনের গতি দিন দিন ভীষণ হতে ভীষণতর ক্ষিপ্রতা লাভ করবে।

চন্দ্র। কেন? সমাজের এমন কি অবস্থা উপস্থিত হয়েছে যে, বিধবাদের আবার বিবাহ না দিলে আর চলেনা, সমাজ হতে কি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য লোপ পেতে বসেছে বলে তুমি মনে কর? আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে তুমি জান?

হরি। জানি। তাঁর কথা শুনেছি—তিনি দেবী। আমি উদ্দেশে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করি। জানি, আপনি তাঁকে ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত ভার দিয়েছেন, তিনি রাত্রদিন পূজা-অর্চ্চনা এবং হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে ও শ্রবণে অধিকাংশ সময় যাপন করেন। অন্তঃপুরের প্রায় সর্ব্ববিষয়েই তাঁর কর্তৃত্ব আছে। আপনার বাড়ীর ছেলে মেয়ে এবং বধূরা তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করেন,, সবই জানি।

চন্দ্র। তবে?

হরি। এ আদর্শ ঘরে-ঘরে কোথায় পাব? সকলেরই শিক্ষা এবং সংসারের অবস্থা আপনার মত হওয়ার নিশ্চয়তা কি? আমরা যে অত্যন্ত অধঃপতিত হয়েছি, আমরা আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি এইজন্য দেশ কাল ভেদে আদর্শ অনুরূপ করতে বসেছি।

চন্দ্র। কি পাগল! আদর্শ কখনো এক ভিন্ন দুই হয়?

হরি। সহস্র হয়, দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে আদর্শ অবশ্যই ভিন্ন হয়; দেশ-ভেদে,—যেমন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের আদর্শ কখনই এক হতে পারে না—"the East is East, the West is West, the two shall never meet." কালভেদে, যেমন সেই আর্য্য-সভ্যতার শৈশবের—সেই বৈদিক যুগের, এবং এই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পতিত এই কলিযুগের আমাদের আদর্শ কোনো ক্রমেই এক হতে পারে না। আবার পাত্রভেদে, যেমন, স্ত্রী বা পুরুষের, বালক বা বৃদ্ধের, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের, সুস্থের বা রোগীর ইত্যাদি পাত্রভেদে আদর্শ অবশ্যই ভিন্ন হবে।

চন্দ্র। তুমি কি তবে বলতে চাও যে ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে বিধবার বিবাহই বর্ত্তমানে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত?

হরি। বড় যে কথায় কথায় আদর্শ ফলাচ্ছেন, আদর্শ আপনারা কি রাখতে পেরেছেন? ব্রাহ্মণের গায়ত্রী ভুলে যাবে সেজে দাসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সাহেবের তাঁবেদারী করা কি হিন্দুর আদর্শ? মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়া এবং বাপ বলতে শালা বলা কি হিন্দুর আদর্শ? স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হলে আর একটা বিয়ে করে প্রথমা পত্নীকে মর্ম্মান্তিক পীড়ন করাই কি হিন্দুর আদর্শ? এই সকল যদি হিন্দুর আদর্শ হয়, তবে সে হিন্দু জাতি, সে হিন্দু সমাজ; সে হিন্দু ধর্ম্ম অতল জলে ডুবে যাক। সমাজে কয়টা আদর্শ রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি এবং অদূর ভবিষ্যতে সক্ষম হব বলে আশা করতে সাহস করছি? তবে এই নিরপরাধিনী অবলাদের উপর যত আদর্শের বোঝা চাপাতে গিয়ে এমন করে কেন সমাজের সর্ব্বনাশ করি? আমরা নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখি নে আমরা কতদূর অধঃপাতে গিয়েছি। আমাদের চোখের উপর দিবা-রাত্রি অপ্রতিহতভাবে যে পাপের স্রোত চলেছে, আমরা তাতে নীরব। এই কি আদর্শ? আবার বলি, কতশত ধর্ম্মহীন ধনশালী ও পদস্থ পাষণ্ডকে আমরা নির্ব্বিবাদে সমাজে স্থান দিয়ে রেখেছি আর কি না যে সকল সোনার চাঁদ যুবকেরা ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সুসভ্য স্থান হতে বিদ্যোপার্জ্জন করে এসে দেশের মুখোজ্জ্বল করচে—ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, সিভিল-সার্জ্জন, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি হয়ে আসচে, কেউবা য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে গিয়ে, বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়ে, সভ্যজগতের কাছে প্রাচীন ভারতের মুখোজ্জ্বল করচে; তারা কিনা আমাদের নিকট হতে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ম্লানমুখে, ব্রাহ্ম সমাজে অথবা খৃষ্টান সমাজে মিশছে। একটা সমাজ ভিন্ন মানুষ কি করে থাকতে

পারে? "Man is a social animal, as social as any ant or bee."

চন্দ্র। তথাপি আদর্শ কি কখনো ছাড়া উচিত?

হরি। না, কখনই না। কিন্তু যে কারণেই হোক, আমরা আদর্শ শিথিল করে ফেলেছি, একথাও অস্বীকার করতে গেলে মিথ্যা কথা বলা হয়। আমি হিন্দু, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমি কেমন করে অস্বীকার করব যে সংযম অপেক্ষা ধর্ম্ম নেই? আমি কেমন করে অস্বীকার করব যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাপেক্ষা পবিত্রতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোনো জাতি দেখাতে পারে নি? এ আদর্শ অন্যত্রও অদৃত। আমি বেশ জানি, য়ুরোপেও আজো দু'একটি অল্পবয়স্ক বিধবা রমণীকে জীবনের অবশিষ্টকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, মৃত স্বামী-দেবতার ধ্যানে অতিবাহিত করতে দেখা যায়। আমি সাহস করে বলতে পারি, এ পবিত্র হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলেও, সহস্র সহস্র হিন্দু-নারী স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে থাকবেন। কারণ হিন্দু-রমণী স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করতে জানেন।

চন্দ্র। ভায়া, বাঁধ একবার ভাঙ্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?

হরি। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে একথা স্বীকার করি যে, এ প্রথা প্রচলিত হলে অবিমিশ্র মঙ্গল হবে না। —এসংসারে কোনো কার্য্যেই তা হয় না। তবে হিসাব করে দেখতে হবে, যদি কোনো কার্য্যে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের ভাগ অধিক হয়, তবে তা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে মঙ্গলই অধিক হবে। অনেক স্থলে হয় তো বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু এতদ্দ্বারা সমাজের যে মহা কল্যাণ হবে তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চন্দ্র। যদি স্ত্রীলোকের মনে বিশ্বাস থাকে, এ-স্বামী মরিলে আবার স্বামী হবে, তবে কি তারা আর স্বামীকে তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে?

হরি। প্রথমত, এ অতি নীচ, স্বার্থপর এবং কাপুরুষের মত কথা। আমার নিজের গুণে যদি আমি স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করতে না পারি, তবে ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে এবং আমি মরলে তাকে অনন্যোপায় হতে হবে, এইরূপ সামাজিক শাসনে রেখে ধরে বেঁধে তার শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখা আমি চাই নে। তা কখনই আন্তরিক হয় না, কেবল মৌখিক। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে স্ত্রী মরলে আমাদের ডজন্ ডজন্ বিয়ে হতে পারবে, কিন্তু তাই বলে কি আমরা বর্ত্তমান স্ত্রীকে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করে থাকি? যাঁরা এ প্রশ্ন করেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্ত্রীকে অশ্রদ্ধা করেন। নব্যেরা তা করেন না। আজ কাল নব্যের মধ্যে কারো স্ত্রী-বিয়োগ

হলে তাকে পুনরায় বিবাহ দিতে কিরূপ বেগ পেতে হয়, তা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রাচীনেরা বিলক্ষণ স্বামীগিরি ফলিয়ে আসছেন জানি। এইজন্যই দেখতে পাই দাসীরও যেটুকু স্বাধীনতা ও সম্মান আছে, হিন্দুর স্ত্রীর তাও নেই। এই সকল নারীর গর্ভজাত সন্তানদের "বাঁদিকা বাচ্ছা" বললে কি অপরাধ হয়? হায়, তাই বুঝি আমাদের সমাজে আজ এত কাপুরুষ?

চন্দ্র। ছি ছি এসব কি বল? তুমি ক্ষেপে উঠবে দেখছি। তুমি বলতে চাও যে বিধবা-বিবাহের জন্যেই দেশ-উদ্ধার আটকে আছে?

হরি। মানুষ স্বভাবতই একটু প্রভুত্বপ্রিয়। কিন্তু আজকাল যাদের ঘরের বাইরে ঝাঁটা জুতো খেয়ে দিন যায়, তারা যদি ঘরে এসেও একটু প্রভুত্ব না করবে, তবে আর বেচারীরা যায় কোথা? বাইরে যাকে ঘুসি খেয়ে, ড্যাম শুয়ার শুনে, নীরবে ঢোক গিলতে হয়, সে যদি কোমলাঙ্গী পতিগত-প্রাণার সামান্য ত্রুটীর অছিলা করে' সেই কোমলাঙ্গে আপনার দৃঢ়তা পরীক্ষা না করবে, তবে আর উপায় কি? যারা বাড়ীর প্রাচীরের বাইরের খবর রাখে না, তাদের কাছে ভিন্ন তাঁদের বীরত্বের কাহিনী বলে বিশ্বাস করাবার আর স্থান কোথায়?

চন্দ্র। সমাজে সবই কি এই প্রকার?

হরি। সাড়ে চোদ্দ আনা।

চন্দ্র। যদি তাই হয়, তবে কি বিধবার বিয়ে দিলেই সব বন্ধ হ'য়ে যাবে?

হরি। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা বালবিধবার পুনর্বিবাহে মত দেবেন, তাঁরা জোর করে কাল্পনিক উপায়ে স্ত্রীর ভক্তি আদায় করতে চান না, ইহাই বুঝতে পারা যায়। যাঁরা জানেন 'আমি ম'লে স্ত্রীর আর গতি নাই' এই ভেবে সে নিশ্চয়ই আমার যথেচ্ছাচার সহ্য করবে, তাঁদের মনে স্ত্রীর প্রতি অযথা অত্যাচার করবার প্রলোভন হওয়া অনেক স্থলে স্বাভাবিক,—হয়েও থাকে তাই। নিজগুণে তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণের যত্ন তত আসে না। এসকল স্ত্রীও কাজেই নিস্তেজ হয়, এবং তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সন্তানও কাপুরুষ, ভীরু এবং স্বাস্থ্যহীন হয়; বড় হয়ে পিতার ন্যায় "ঘরে এসে স্ত্রী ঠেঙানোর" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সংশিক্ষা দিয়ে, আপনারাও একটু ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এবং স্ত্রীলোকদিগকে তা শিক্ষা দিয়ে, সংসারে সংযম, সাত্বিকতা, পবিত্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করুন, তা হলে বিধবা-বিবাহ প্রচলনে সমাজের ক্ষতি হবে না।

চন্দ্র। যাঁরা বিধবা-বিবাহে আপত্তি করেন, তাঁরা কি তা চেষ্টা করেন না?

হরি। করতে পারেন। কিন্তু দশজন খবরের কাগজের এডিটর, পাঁচজন টোলের অধ্যাপক অথবা বিশজন বৃদ্ধ নিষ্ঠাবান ভাগ্যবান বড়লোক নিয়েই তো সমাজ নয়। আর তাঁরা "এই প্রকার হওয়া

উচিত" বলে প্রবন্ধাদি লিখলেই সমাজের অবস্থা যে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, তা অসম্ভব।

চন্দ্র। কিসে অসম্ভব? যদি আমরা আবার সমাজে সংশিক্ষা পুনরানয়ন করি, তবে কি সমাজের পবিত্রতা রক্ষিত হতে পারে না? হয় তো কিছু বিলম্ব হবে। এর মধ্যে যারা অধঃপাতে যাবে যাক্;—কি করা যাবে? তা বলে সমাজের এমন সংশাসন-গ্রন্থি শিথিল করতে যাওয়া কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের হিন্দু নারী যে আজো দেবী। তাঁদের একবার ম্লেচ্ছ, যবনের মত করে ফেললে আর কি সে দেবীর ভাব ফিরে পাব? তোমরা কি করতে যাচ্ছ? মনে দিক্কার আসে না?

হরি। আসে ঠাকুরদাদা,—কান্না আসে। যা যায় তা আর সহজে আসে না, তাও জানি। বড় দুঃখেই এড্‌মণ্ড্‌ বার্ক বলেছেন "The days of chivalry are gone!" কিন্তু gone তো নিশ্চয়ই। Days of economists and calculators তো নিশ্চয়ই এসেছে,—কে রোধ করবে? কার সাধ্য কালের গতি রোধ করে? এখন সময়ের সঙ্গে চলতেই হবে। বিধবার আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য বজায় রাখতে হলে সমাজের এবং পরিবারের যেরূপ অবস্থা থাকা আবশ্যক, পূর্ব্বে অনেক পরিমাণে তা ছিল, এখন নেই এবং উত্তরোত্তর তা আরো লোপ পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ, জীবন-সংগ্রামের বৃদ্ধি—increased and ever-increasing struggle for existence. ইহা অনিবার্য্য। তার আরো দুটি কারণ আছে; (১) অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের সংঘর্ষণ (২) আমাদের সমাজের পুরুষ জাতির অধঃপতন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

একাদশী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘর্ম্ম-শীতল, মৃদু-কম্পিত শিথিল হাতখানি একাদশীর হাতের উপর রাখিয়া ফুরিণ কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, পারিতেছিল না। ধারার পর ধারা বহিয়া অশ্রুস্রোত নিঃশব্দে উপাধান সিক্ত করিতেছিল! উঃ কি নিদারুণ অবস্থা!

"একাদশী!"

"দাদা!"

বড় করুণ, নিস্তেজ স্বরে ফুরিণ বলিল,

"আমার তো কিছু নেই একাদশী, তুমি এই পিস্তলটা নাও,—আমার চিহ্ন—শেষ উপহার।"

একাদশী পাগলের মত আছড়াইয়া পড়িল। মরণাতুর ফ্লুরিনের চোখ ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, একটা গভীর মর্ম্মভেদী কোলাহলে সা বা ড়ী থানা মুখর হইয়া উঠিল।

(৬)

সমস্ত দিনটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল কেহ সংবাদ লইল না। সন্ধ্যার পর সাহেব যখন ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে বাড়ী ঢুকিতেছিলেন তখন দেখিলেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় একাদশী ধীরে ধীরে কুঠীর বাহিরে আসিতেছে, তাহার মুখখানা পাথরের মূর্ত্তির মুখের মত অচঞ্চল ভাবহীন; দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল; বুকের স্পন্দনও বুঝি অস্বাভাবিক ক্ষীণ!

সাহেবকে দেখিয়াও একাদশী অভিবাদন করিল না, যেমন চলিতেছিল, তেমনিই চলিয়া যায় দেখিয়া সাহেব তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্নেহময় স্বরে ডাকিলেন—"একাদশী!"

অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিতের মত একাদশী চমকিয়া উঠিল! অর্থশূন্য দৃষ্টিতে নীরবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, কিছু বলিল না।

সাহেব আবার ডাকিলেন,—আবার ডাকিলেন, তথাপি একাদশী নিস্তব্ধ অবিচল! সাহেব তাহার হাত ধরিয়া কুঠীর ভিতর টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ যেন একাদশীর চমক ভাঙ্গিল; সজোরে হাত টানিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক সাহেব তখনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, "কোথা যাচ্ছ একাদশী, মেঘ করে আসছে, কাল সকালে তোমার ভাইয়ের কাছে যেয়ো।"

ভয় স্খলিত-কণ্ঠে একাদশী বলিল, "ভাই, সমুদ্রের ধারে একলাটি ছোট ছেলে ঘুমুচ্চে, মেঘ আসচে, ছাড়ো সাহেব আমি সেখানে যাই।"

"পাগল"—সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া ঘরে আনিলেন, একটা চৌকির উপর তাহাকে বসাইয়া কত কথা বুঝাইলেন একাদশী ডান হাতের উপর মাথা কাত্ করিয়া—অন্য হাত গালে দিয়া বিহ্বলের মত তাঁহার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল; সে কিছুই বুঝিল না!

তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই কষ্টের উপর কষ্ট বাড়িয়া গেল। একে একে সকলেই তাহাকে কত সান্ত্বনা দিল কিন্তু একাদশী কাহারো কথার কিছু জবাব দিল না।

অবশেষে সাহেব বলিলেন, "আর ওয়ালটেয়ার ভাল লাগ্‌ছে না, চল একাদশী আমরা ওয়ালটেয়ার ছেড়ে যাই।"

আহত ভুজঙ্গের ন্যায় একাদশী লাফাইয়া উঠিল। কথাটা বিদ্যুদ্দৃপ্ত সূক্ষ্ম স্পর্শের মতই তাহার অসাড় প্রাণটাকে সজোরে

আলোড়িত করিয়া তুলিল। বুকভাঙা কাতরতায়, প্রাণভরা বেদনায় একাদশী চীৎকার করিয়া উঠিল, "থামো সাহেব থামো, ও কথাটি বোলো না, ফ্লরিণকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না!"

(৭)

পরদিন সকালে কেহ আর শোকোন্মত্ত একাদশীকে খুঁজিয়া পাইল না।

উদ্বেগ-কাতর সাহেব সমুদ্রের ধারে, বড় রাস্তায়, বাগানে, সহরের অলি-গলি—এমন কি তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন। কুঠীর সকলেই শশব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিল; সাহেব নিজেও গোরস্থানের দিকে চলিলেন—কি জানি, যদি সেখানে গিয়া থাকে।

পূর্ব্ব রাত্রের বৃষ্টি-বারি-ধৌত বৃক্ষ লতা পত্র পুষ্প সকল তরুণ লাবণ্যে প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণোদ্ভাসিত হইয়া হাসিতেছে। বিরাট সমাধি-ক্ষেত্র নিস্তব্ধ। সাহেব দ্রুতপদে গোরস্থানে ঢুকিলেন। উদ্বিগ্ন নয়নে চারিদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন, দূর হইতে দেখিলেন—ঐ ফ্লরিণের কবর! হাঁ তাই ঠিক! কবরের গায়ে মাথা রাখিয়া, ভিজা মাটির উপর ঐ যে কে একজন অসাড়ে ঘুমাইতেছে! কি চমৎকার নিশ্চিন্ত মুখ! সাহেব বেগে ছুটিলেন—"একাদশী—একাদশী!"

একাদশীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া ব্যাকুলভাবে সে কবরের দিকে চাহিল। "নাঃ ফ্লরিণ ঠিকই আছে, যাক্ বাঁচা গেল!" আশ্বস্ত ভাবে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে সে কবরের মাথার দিকটা চাপড়াইতে লাগিল।

সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন "একাদশী।"

মা যেমন ছেলের কাঁচা ঘুম ভাঙবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন, একাদশীও তেমনি হইয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত ভাবে চাপা গলায় সে বলিল, "কি, এখানে কেন?"

"তুমি আর এখানে কেন একাদশী? এখানে পড়ে থেকে আর কি করবে?"—

"কি করবে?" একাদশী খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রশ্ন সে যে জীবনে কখনো শুনে নাই! তাহার যা-কিছু কাজ করিবার আছে তাহা তো এইখানেই!—এমন সোজা কথাটা ইঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না!—কি নির্ব্বুদ্ধিতা!

বেদনা-পীড়িত স্বরে সাহেব বলিলেন, "অনর্থক এসব পাগলামি করে কোনো ফল নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারুর ক্ষমতা চলে না!"

"ঈশ্বর!" অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে একাদশী একবার আকাশ-পানে চাহিল। "বেশ সাহেব, তবে তোমরা চলে যাও, আমায় জ্বালাতন কোরো না...আমার ফ্লরিণ এখানে আছে, আমিও থাক্‌বো।

সাহেবের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল "অন্ধ ভ্রান্ত, ফ্লরিণ কি আর এ জগতে আছে? সে যে এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছে!"

সহসা একাদশী গর্জ্জিয়া উঠিল!

"মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর!"—ইহারা সকলে মিলিয়া শত্রুতা সাধিতে চায়! তাহার শান্তির অবলম্বনটুকু চুরমার করিবার জন্যই ইহাদের সকলের চেষ্টা! কি ভয়ানক! যাও, সে কাহারো কথা শুনিতে চাহে না, তাহার ফ্লরিণ এই খানেই আছে!—একাদশী কবরের উপর বুক দিয়া প্রাণপণে মৃত্তিকা আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিষাদ মথিত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাহেব পাশে বসিলেন। "একাদশী তোমার মন বড় খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছি চল বাবা তোমায় নিয়ে এ দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাই।"

তীরবেগে একাদশী উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদের হাসি! "ওঃ! বুঝেছি সাহেব আমাদের দুটোকে তফাৎ করাই তোমাদের মতলব, আর কিছু না! কিন্তু সেটি হবে না!——

ঝটিতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, একাদশী মুখে তাহার নল পুরিল, মুহূর্ত্তে ঘোড়া টিপিল!

হাঁ হাঁ করিয়া সাহেব উঠিতে-না-উঠিতে দড়াম্ করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল! একাদশীর প্রাণহীন দেহ কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল! সারা কবরটা রক্তে রক্তময়——টকটকে লাল হইয়া সূর্য্য-কিরণে ঝলসিয়া উঠিল!

স্তম্ভিত সাহেব মুহ্যমান নিস্পন্দ!

যে শূন্যগর্ভ মারাত্মক উপহার ফ্লরিণ স্নেহশীল সুহৃদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, যন্ত্রণা-উন্মাদ সুহৃদ তাহাতে বজ্রানল ভরিয়া সযত্নে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল! কেহই জানিতে পারে নাই!

(সমাপ্ত)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উভয় বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। উভয় বাদই সাধু হইলেও আপোষে কিন্তু অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার মনে করেন তাঁহারা তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া ব্যক্ত করেন। সাকার-বাদীরা বলেন যে, ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া না মানিলে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে নিরাকারের অপলমতা হইয়া উঠে এবং তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া মান্য হইতে পারেন না। কারণ তাহা করিলে তাঁহাতে সগুণত্ব আরোপ করা হয়। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে সহজে আপনিই তাঁহার শরীরীত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন ঘটকর্ত্তা কুম্ভকার শরীরী, সে কদাপি অশরীরী নহে। যাহা হউক শাস্ত্রে যখন উভয় বাদই সাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে তখন উভয় বাদই হিন্দুর মান্য।

ঈশ্বর-প্রাপ্তির মার্গ ত্রিবিধ; —যথা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। গৃহস্থদিগের জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগকে সমাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। কেবল জ্ঞান, কি কেবল কর্ম্মে হিন্দু পরিমুক্ত হইতে পারে না; জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় যোগেই পরিমুক্ত হয়। যেমন উভয় পক্ষের সহযোগে পক্ষীদিগের আকাশে গতি হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় যোগে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; অন্যথা হইতে পারে না। কর্ম্মও দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। জ্ঞানপূর্ব্বক নিবৃত্তি অন্যথা ভোগার্থ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব নিবৃত্তি মার্গে কর্ম্মের সেবা করিলে তৎফলে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করা যায় (গ)। প্রবৃত্তি মার্গে যে গৃহস্থ কর্ম্ম করে তাহার সংসারে পুনরাগমন হয়, নিবৃত্তিমার্গে পুনরাবৃত্তি নাই; এ কারণ সর্ব্ব বেদান্তে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে দেবযান ও পিতৃযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রবৃত্তি মার্গের নাম (পিতৃযান) ইহাকে দক্ষিণায়ণ বলে, তদ্দ্বারা চন্দ্রলোকে গতি করিয়া কর্ম্মানুসারে সুখভোগ করত ভোগাবসানে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। নিবৃত্তি মার্গের নাম (দেবযান) তাহাকে উত্তরায়ণ বলিয়া বেদে স্তুত করিয়াছেন; তদ্দ্বারা সূর্য্যলোকে গতি করিয়া ভোগবর্জ্জিত ঈশ্বরার্পিত জ্ঞান পূর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষমতাতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাহার আর পুনরাবৃত্তি নাই। অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তিকে নিবৃত্তি মার্গে বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে হইবে।

যে কর্ম্মই কর, তাহাতে তোমার বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। বিশ্বাস ব্যতীত কর্ম্মের আর অন্য স্থান নাই। বিনা বিশ্বাসে কর্ম্মের ফল হয় না। যে ব্যক্তির বিশ্বাস আছে, তাহার সর্ব্ব কালেই কর্ম্মের ফল অনুভূত হয়। বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তির কর্ম্মের ফল কদাপি ফলে না। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, "বিশ্বাসাজ্জায়তে সিদ্ধি র্ন সিদ্ধিঃ সংশয়াত্মনঃ" অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হয়; সংশয়াত্মার কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না।

ভক্তি মার্গের সুলভা গতি। তাহার লক্ষণ যথাঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং॥
(শ্রীভাগবতং)।

লীলা শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন, নাম স্মরণ, পদ সম্বাহন, গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা, স্তুতি, সেবা, সখ্য, আত্ম নিবেদন এই নববিধ ভক্তি দ্বারা উপাসনায় মোক্ষ লাভ হয়।

(গ) প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং। জ্ঞান পূর্ব্বং নিবৃত্তং স্যাৎ প্রবৃত্তিরন্যথা। নিবৃত্তিঃ সেব্যমানস্তু যাতি তৎ পরমং পদং। ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

যদি বল, নব লক্ষণ ভক্তি এক সাধকের সাধ্য নহে। উত্তর—সম্যক্ করণে অক্ষম হইলেও একের অনুষ্ঠানে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, অতএব ভক্তিমার্গে উপাসনাই সুলভ যথা,—

শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে।
পদাব্জ ভজনে লক্ষীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূর স্তুতিবন্দনে। কপিপতির্দাস্যেথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে।
বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥
শ্রীরূপোক্তিং।

রাজা পরীক্ষিৎ লীলা শ্রবণে, শুকদেব গুণ কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ নাম স্মরণে, লক্ষী চরণ সেবনে, পৃথুরাজা পূজায়, অক্রুর স্তুতিতে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যকরণে, বলিরাজ শরীর নিবেদনে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রচলিত রীত্যনুসারে হিন্দুজাতি বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায়ে বিভক্ত কিন্তু তদতিরিক্ত আরও তিনটি সম্প্রদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা শাক্ত, নানকসাহি এবং জৈন। এক্ষনে হিন্দুজাতি এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালী পৃথক হইলেও জৈনগণ হিন্দু এবং তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিষ্ণুর উপাসক। এই সম্প্রদায়ের বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রের উপদেশে আস্থা প্রদর্শন করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ষোড়শ শাখা যথা,—

(১) বৃন্দাবনী গোঁসাই, (২) গোকুল গোঁসাই, (৩) সখীভাব, (৪) রামানন্দী, (৫) বৈরাগী, (৬) বিরক্ত, (৭) নাগা, (৮) রামাতুজি, (৯) কবীর পন্থী, (১০) দাদুপন্থা, (১১) রায়দাসপন্থী, (১২) হরিচন্দী, (১৩) সত্নাপন্থী, (১৪) মাধবী, (১৫) সাধবী, (১৬) চরণদাসী।

বৃন্দাবনী গোঁসাইগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাধাকৃষ্ণ ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। বিশেষ বিশেষ উপাসনানুযায়ী ইঁহারা রাধাবল্লভী, বিহারীজী, রাধারমণী, গোবিন্দজী এবং যুগলজোড়ী নামে খ্যাত। ইঁহারা রাধাবল্লভজী, বিহারীজী, যুগলজোড়ী প্রভৃতির মূর্ত্তি আপন আপন গৃহে রাখেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেইসকল মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। সময় সমাগত হইলে উল্লিখিত গোঁসাইদিগের চেলারা এবং সাধারণ তীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তি দর্শন করেন এবং প্রণামী দেন। অবশ্য প্রণামী গোঁসাইগণের প্রাপ্য এবং তাঁহারা তাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। শিষ্য করিতে হইলে চতুর্বর্গের কোন বাচবিচার নাই বলিয়া জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গোঁসাইদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারে, সুতরাং শিষ্যবৃত্তি ও গুরুগণের একটি ধনাগমের উপায় বলিতে হইবে। মন্ত্র লইবার পরই শিষ্যগণকে কণ্ঠি ধারণ এবং কপালে তিলক সেবা

করিতে হয়। তিলক ধারণেরও আবার বিশেষত্ব আছে। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ একবার স্থাপিত হইলে তাহা আর যাইবার নহে। পুরুষানুক্রমে সে সম্বন্ধ অচল অটল হইয়া থাকে।

গোঁসাই গোকুল বা গোকুলস্থ সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত বৃন্দাবনী গোঁসাইদিগের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। প্রায় গুজরাটী বণিকগণ এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। শিষ্যগণ পুরুষ ও স্ত্রী নির্ব্বিশেষে গুরুচরণে তনু মন ধন অর্পণ করেন। তাঁহারা অশক্তে একবার এবং শক্তে তিনবার গুরুসন্নিধানে আসিয়া আপনাদিগের উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। শিষ্যদিগের গুরুভক্তির সীমা এতদূর বিস্তৃত যে, তাহারা নব বিবাহিত বধূকে বরগৃহে আনিবার পূর্ব্বে একবার গুরু-সকাশে লইয়া যায়। অধিক লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। বলা বাহুল্য যে তাহারা গুরুর আদেশ ঈশ্বরের আদেশের ন্যায় মান্য করে। এইরূপে গুরুগণ শিষ্যদিগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকেন। সুতরাং গুরুবর্গের সকলেই সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি।

সখীভাব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শারীরিক ও মানসিক স্ত্রীত্ব ভাবাপন্ন। রাধাকৃষ্ণ ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। স্ত্রীভাবে ইঁহারা ভজনা করেন। বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে এমন কি পরিচ্ছদেও ইঁহাদিগের স্ত্রীভাব অভিব্যক্ত। এ বিষয়ে যতই স্বল্প বলা হয় ততই ভাল।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম রামানন্দ। ইনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। সুতরাং সকলেই ইঁহাকে মান্য করিত। ইঁহারা রাম ও হনুমানের উপাসক। কণ্ঠিধারণ ইঁহাদিগের বিশেষ বিধি। বৈরাগী এবং গৃহস্থ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দলভুক্ত হইতে পারেন।

বৈরাগী সম্প্রদায়ের জাতি-বিচার নাই। সুতরাং এই ধর্ম্ম সকলেরই সহজলভ্য। বৈরাগী হইতে হইলে শিরোমুণ্ডন, গলায় কণ্ঠি এবং হস্তে জপমালা ধারণ করিতে হয়। ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীবিকা। তবে ইঁহাদিগের কেহ কেহ সঙ্গতিপন্ন। কৃষ্ণ ইহাদিগের উপাস্য দেবতা।

বিরক্ত সম্প্রদায়। বিরক্ত অর্থে বিষয়-বাসনা নির্ম্মুক্ত বুঝায়। শিরোমুণ্ডন এবং অর্থগ্রহণ হইতে বিরত থাকাই এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। দৈনিক আহারের যতটুকু আবশ্যক ততটুকুই ইঁহারা ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের পরিধানে একমাত্র ল্যাঙ্গোটি এবং চাদর ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যায় না। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অতীব বিরল। ইহাদিগের উপাস্য দেবতা রাম ও কৃষ্ণ।

নাগা। বিলম্বিত কোঁকড়ানো কেশ, কটিতটে ল্যাঙ্গোটি এবং অঙ্গে ভস্মলেপন নাগাদিগের বাহ্যিক চিহ্ন। ইহাদিগের দল সুবৃহৎ এবং ইহারা সদাই শস্ত্রপাণি। অসি, চর্ম্ম, বন্দুক এবং ভল্ল ইহাদিগের অস্ত্র। প্রয়াগ এবং হরিদ্বারের মেলায় ইহারা দলবাঁধিয়া আগমন করে।

সন্যাসীদিগের সহিত ইহাদিগের চির-শত্রুতা। দুইদল সন্নিকর্ষে আসিলেই তুমুল দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় এবং ইংরাজ সরকার বাধা না দিলে অনেকেই হতাহত হইয়া থাকে। নাগারা ভিক্ষোপজীবী।

রামানুজী সম্প্রদায় লক্ষ্মণের উপাসক। ইঁহারা মালাধারণ করেন বটে, কিন্তু রামানন্দী সম্প্রদায়ের ন্যায় কন্ঠি এবং জপমালা ধারণে বিশেষ কঠোর বিধি নাই। ইঁহারা অলন্ত লৌহ দ্বারা হস্তে বিষ্ণুপদ, শঙ্খ এবং দণ্ড চিহ্নিত করেন। এই চিহ্ন আমরণ থাকিয়া যায়। ইঁহারা গোপনে রন্ধন ভোজন এবং পান করেন। বিষ্ণুকে ইঁহারা ব্রহ্ম বলিয়া মানেন। ইঁহাদের মতে বিষ্ণুই জগতের আদিপুরুষ।

কবীরপন্থী। কবীর সিকেন্দার লোদীর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং কবীর-পন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি জাতিতে তন্তুবায় এবং ইঁহার নিবাস বারানসীধামে ছিল। যৌবনে ইনি রামানন্দের শিষ্য হন এবং গুরুর উদাহরণ মত কন্ঠি এবং জপমালা ধারণ করেন। পরে কবীরের খ্যাতি দিক্‌দিগন্তে ব্যাপিয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি সেই সুযোগে আপনার একটি দল গঠিত করিলেন। জীবদ্দশায় কবীর একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। অদ্বৈতবাদের উপর ইনি অনেকগুলি দোঁহা রচনা করিয়া যান। সেগুলি এক্ষণে পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে। অনেকে সেই দোঁহা-গুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের ভিক্ষাই উপজীবিকা। বারানসীধামে কবীর-চওড়া নামক মহল্লায় বহু সংখ্যক কবীরপন্থী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দাদুপন্থী। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম দাদু। কন্ঠি এবং জপমালা ধারণের প্রচার ইনি বহুল পরিমাণে করেন। ঈশ্বরের পূজা-পদ্ধতি এবং ঈশ্বরজ্ঞানের উপায়াদি-সম্বন্ধে ইঁহার একখানি পুস্তক আছে। শিষ্যেরা এই গ্রন্থ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। সংসারী ব্যক্তি যে এদলে নাই একথা বলিতে পারা যায় না। ইঁহারা অধিকাংশই ভিক্ষুকবেশে থাকেন এবং কিরীটী ধারণ করেন। উইলসন সাহেবের মতে দাদুর জন্ম আহমদাবাদে। যখন ইঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ তখন ইনি আজমিরে সম্বর নামক স্থানে সমাগত হন। ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ইঁহার নারায়ণ নামক স্থানে যাইবার ইচ্ছা জন্মে। সে বাসনা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু বহেরণা পর্ব্বতে যাইবার জন্ত তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল। তিনি অচিরে তথায় গমনপূর্ব্বক ভগবানে তন্ময় হইয়া লোক-দৃষ্টির বহির্ভূত হন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার প্রাদুর্ভাব কাল।

রায়দাসপন্থী। রায়দাস জাতিতে মুচি। জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। সংসারাশ্রম তাঁহার পক্ষে ভারবহ হইয়া উঠিল। তিনি

কালবিলম্ব না করিয়া মায়াপাশ ছিন্ন করত ভগবানের নাম লইয়া সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পবিত্রতা ও ভক্তি-সহকারে তিনি যেমন পূর্ণতা লাভ করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ক্রমশঃ আকর্ষিত হইতে লাগিল। কাল-সহকারে তিনি একদলের নেতা হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ জাতিতে চামার। এলাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কড়া নামক স্থানে এই পন্থীর প্রধান আড্ডা। "রায়দাস" চামার জাতির সম্মানসূচক শব্দ। এই শব্দে অভিহিত হইলে চামার জাতির আনন্দের আর সীমা থাকে না।

হরিচন্দি। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। গ্রহবৈগুণ্যে তিনি বারানসীধামে সমাগত হইয়া জনৈক ডোমের দাস হন। শবদাহার্থে লোক আসিলে তাহার নিকট হইতে কর আদায়ই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ঘটনাসূত্রে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সন্তানের শবদেহ লইয়া আসিলে পাছে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হন ভাবিয়া বিনা করে পুত্রের অগ্নি-সংকার করিবেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার স্ত্রী শৈব্যারও হস্তে এমন কিছুই ছিল না যে তাহা দিয়া পুত্রের মৃতক ক্রিয়া করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া কর-স্বরূপ তাঁহার স্ত্রী স্বীয় বস্ত্রার্দ্ধ প্রদান করিবামাত্র দৈবীমায়া তিরোহিত হইল। অমনি স্বর্গ হইতে একটি বিমান ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের তিনজনকেই অমর নগরে লইয়া গেল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং কোনো সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক না হইলেও ডোমজাতি তাঁহার নামে এক পন্থী স্থাপিত করে; তাহাই হরিচন্দী নামে খ্যাত।

সদনাপন্থী। সদনাপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম সদনা। ইনি জাতিতে কসাই। প্রবাদ এইরূপ যে, ইনি একদা জনৈক সন্ন্যাসীর সন্নিধানে গমন করত জিজ্ঞাসা করেন যে কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। সন্ন্যাসী তাঁহাকে এক প্রস্তর-মূর্ত্তি দান করেন। সদনা সেই মূর্ত্তিতে মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তাঁহার বিমল চৈতন্যের বিকাশ হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ক্রমে শিষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে একটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাই সদনাপন্থী নামে খ্যাত।

মাধবী। মাধব নামে জনৈক সন্ন্যাসী এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। মাধবীগণ "বালবন" নামক বাদ্য বাজাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত কালযাপন করে।

সাধনী। সাধন নামক জনৈক সন্ন্যাসীর অভ্যুদয় প্রথমে বুন্দেলখণ্ডে হয়। ইনি একটি সম্প্রদায় গঠিত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বীয় দলভুক্ত করেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাই প্রতীতি জন্মে যে,

হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাধক নবাগত ব্যক্তিদিগকে সহসা স্বীয় দলে স্থান দিতেন না। কিছুদিন ধরিয়া তিনি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেন ও পরে যখন বুঝিতেন যে তাহাদিগের মনে দাঢ্যতা ও তাঁহার আদেশে অচলা ভক্তি প্রকটিত হইয়াছে তখন তিনি তাহাদিগকে আপনার দলভুক্ত করিতেন। হিন্দু মুসলমানে তাঁহার দ্বৈতভাব ছিল না। কিন্তু জনসমাজ কেন নিশ্চেষ্ট থাকিবে? সুতরাং উভয়জাতিই তাঁহার মতের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

চরণদাসী। চরণদাস জাতিতে বণিক। হিন্দু সমাজে ইঁহার জাতি "ধুসর বণিয়া" নামে খ্যাত। ইঁহার নিবাস দিল্লী। ইনি বালসন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি হিন্দিভাষায় একখানি যোগগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান। তাঁহার শিষ্যেরা প্রত্যহ এই গ্রন্থ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। কিম্বদন্তী আছে যে, একদা তিনি অরণ্যে ভগবানের ধ্যানে রত ছিলেন এমন সময়ে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব তথায় আগমন করত তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দেন। এই শিক্ষার প্রভাবে চরণদাস পূর্ণতা প্রাপ্ত হন এবং জাতি-নির্ব্বিশেষে হিন্দুর চতুর্ব্বর্ণকেই শিষ্যভাবে গ্রহণ করেন। কণ্ঠি, মালা, এবং মলিন বস্ত্র এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব।

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য বিষয়ে নারী মিতব্যয়ী হইলে কত বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে যেমন পরিবারের সকলের সুখস্বচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, তেমনি মিতব্যয়ী হওয়াও কর্ত্তব্য। এবিষয়ে নর এবং নারী উভয়েরই সমান দায়িত্ব। এই মিতব্যয়িতা দ্বারাই মানুষ দরিদ্রাবস্থা হইতে প্রভূত ধনশালী হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করা হইল।

আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার গৃহিণীগণ এবিষয়ে অনেকেই আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। সেকালের গৃহিণীগণ যেরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন ও সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা জানিতেন এখনকার গৃহিণীদিগকে প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। সেকালের রমণীগণ অতি সামান্য সামান্য দ্রব্য গুছাইয়া রাখিয়া কত সময় কত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোনো জিনিষ তাঁহারা তুচ্ছ ভাবিয়া নষ্ট করিতেন না। সামান্য তরকারীর খোসা হইতে মসলা-বাধা

দড়িটা পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিয়া কার্য্যে লাগাইতেন। এইসকল কারণে তাঁহাদের সংসারে সহস্র অভাব থাকিলেও একটি লক্ষীর শ্রী দেখা যাইত। আমরা এই সকল কথা শুনিয়া মনে করি দড়িটা না হয় কাজে লাগিল, তরকারীর খোসা আবার কি হইবে? এ সকল ত জঞ্জাল। কিন্তু তাঁহারা ঐ খোসাগুলিকে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিতেন, কত সময় উহা জ্বালাইয়া রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এক বৃদ্ধা ঠাকুরমাতার কথা মনে পড়িল। তিনি যখন পরলোক গমন করেন তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল তিনি নিজে তাঁহার ভাণ্ডার গুছাইয়া রাখিতেন ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডারে বাটীর অন্য কাহারো প্রবেশের অধিকার ছিল না; তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁহার ভাণ্ডারে ছেঁড়া কাপড়ের টুক্রা বাঁধা এত মসলা জমা রহিয়াছে যে, তাহাতে প্রায় ২০০।২৫০ শত লোকের খাওয়া হইতে পারে। ইহা দেখিয়া সকলে অবাক্! সামান্য ২।১ পয়সার মসলা হইতে কিরূপে তিনি এত সঞ্চয় করিলেন! এবং সেই সকল মসলা এত পরিষ্কার টাট্কা যে দোকানের নূতন জিনিষও ওরূপ পরিষ্কার পাওয়া যায় না। পয়সা প্রভৃতি ও সামান্য ২।১ টাকা যাহা হাতে আসিত তাহা হইতে দু এক পয়সা৷ সরাইয়া এ-কৌটা ও-ঝুলি, তাকের কোণে এইরূপ নানাস্থানে রাখিয়া দিতেন। সন্তানদিগের প্রয়োজনে কত সময় ইহা বাহির করিয়া দিয়াছেন তথাপি মৃত্যুর পর যাহা পাওয়া গেল তাহাতে কাঙালী বিদায় ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দক্ষিণা দান প্রভৃতি অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল।

একজন গৃহিণী তাঁহার গৃহস্থলীর কথা বলিতে বলিতে বলেন যে, তিনি মিতব্যয়িতার জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন। তিনি বলেন, আমি ছোট ছেলেদের জন্য কখনো মিথ্যা পয়সা ব্যয় করি নাই। ছেলেদের শৈশব অবস্থায় যে তোমরা কাঁথা তৈয়ার কর, তাহা পরে কি আর তোমাদের কোনো অর্থ-সাহায্যে আসে? আমরা বলিলাম,—না। তাহাতে তিনি বলেন ঐ সকল কাঁথা আমাকে অর্থের সাহায্য করিয়াছে। তোমরা সকলেই ছেঁড়া কাপড় টুক্রা টুক্রা করিয়া কাঁথা সেলাই কর? আমি কিন্তু কখনো তাহা করি নাই; অল্প অল্প ছেঁড়া কাপড় আস্ত পাট করিয়া কাঁথা করিয়াছি; ছেলেরা বড় হইলে সেই কাপড়ের সেলাই খুলিয়া কাচিয়া তাহা দ্বারা বাসন ক্রয় করিয়াছি, তথাপি যখন সেলাই খুলিতাম দেখিতাম একদিন ব্যবহারেও কাপড়ের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। তৎপরে ছেলেদের জামা।—গৃহকর্ত্তার ছেঁড়া পিরাণ, (তোমরা সকলেই জান পুরুষদের পিরাণের তলা খুব শক্ত থাকে, উপর ও হাতা ছেঁড়ে) তাহার তলা কাটিয়া ৩।৪

বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাটীতে পরিবার উপযোগী জামা ইজার প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিয়াছি। সেজন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য সকল ব্যয় সংক্ষেপে করিয়া যে-অর্থ আমার হস্তে সঞ্চিত হইত তাহা ব্যাঙ্কে রাখিয়া ক্রমে উঁহারা একখানি পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আমাদের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে লোকে দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবে কিরূপে ভাবিয়া অস্থির ;—সঞ্চয় ত পরের কথা। কিন্তু তাঁহারা যদি বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বপুরুষ দিগের গার্হস্থ্য দক্ষতা বিস্মৃত না হইতেন তাহ হইলে আজ আর এ কষ্টভোগ করিতে হইত না। দুঃখের বিষয় আমরা সে-সকল অনুকরণ করিতে বড় ইচ্ছুক নহি। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অভাব কিছুতেই মোচন হয় না।"

প্রাচ্য পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন—

"In the family as in the state, the best source of wealth is economy."

সংসারেই হউক আর রাজ্যেই হউক, মিতব্যয়ীতাই ধনাগমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

"Frugality makes an easy chair for all age." মিতব্যয়ীতার দ্বারাই লোকে বৃদ্ধ বয়সে অর্থ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়া আরাম সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব গৃহী ব্যক্তির মিতব্যয়ী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহিনীগণ এই পথ অবলম্বন করিলে অনেক অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবেন।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী হইতে।

বিষয় ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

১। সংসার ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। সংসারের লক্ষ্য ঐহিক সুখ, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য পারত্রিক কল্যাণ। অতএব সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না।

২। ধর্ম্মের যাঁহারা প্রধান সাধক, তাঁহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ; যেমন খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য।

৩। ধর্ম্মসাধনের জন্য নির্জ্জন-চিন্তা, স্বাধীন ভাবে উপাসনাদি চাই, সংসারে পদে পদে তাহার প্রতিবন্ধক।

উত্তর—

১। ধর্ম্ম যাঁহার, সংসারও তাঁহার; সুতরাং দুইয়েরই উদ্দেশ্য তাঁহার প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন।

২। ধর্ম্মের কতকগুলি প্রবর্ত্তক যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদিগের সেরূপ

থাকিবার বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতেন। সাধারণের ইহাই কর্ত্তব্য।

৩। নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন একদিকে ভাল, কিন্তু তাহার বিপদ আছে। সংসারের পরীক্ষায় তাহা টেঁকে না। কত মুনি ঋষির পতন হইল। আর বনেও সজন, গৃহেও নির্জ্জন, মন বশীভূত হইলে। রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

৪। সংসাররক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা দুই পূর্ণভাবে হয় না, একের জন্য অন্যকে ত্যাগ করিতে হয়। দুই শ্রেণীর ব্রাহ্ম দেখা যায়—সংসারী ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম সংসারী।

সংসারী ব্রাহ্ম সংসারকে অগ্রে রক্ষা করেন, ধর্ম্মের ক্ষতি স্বীকার করেন। ব্রাহ্ম সংসারী সংসারের ক্ষতি স্বীকার করিয়া ধর্ম্মকে বজায় রাখেন। সংসার সমরক্ষেত্র—প্রস্তুত হইয়া সেখানে যাইতে হয়। ধর্ম্মের পতাকা-হস্তে—ধর্ম্মের জন্য লক্ষ্য। তজ্জন্য সংসারের লাভেও আনন্দ, ক্ষতিতেও আনন্দ। সংসার-প্রভু—মনুষ্যকে দাস করিয়া খাটাইয়া মনুষ্যত্বশূন্য করে। ঈশ্বর-প্রভু মনুষ্যকে আপনার দাস করিয়া তাহার সেবাতে স্বয়ং নিযুক্ত হয়। ঈশ্বর-প্রভুর সেবাতেই আত্মার পূর্ণতা হয়।

ডিসেম্বর—৮

৫ই ৬ই ও ৮ই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়বাবুকে (গোস্বামী মহাশয়) এই শ্লোকটি লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা সার্থক হইয়াছে বলিলেন।

নামাঙ্ক নস্বস্ত হতত্রপোহ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ্;
গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্ ন মদোন মৎসরঃ।

গুরুবাদ-বিষয়ে বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে যেরূপ গুরুর উপদেশ আছে, তাহাই চাই। বিদ্বান্ গুরু না হইলে ভ্রম ও কুসংস্কারে পড়িতে হয়। ব্রহ্মবাদী ও সত্যবাদী একই কথা বলিলেন। ব্রহ্মবাদীর মুখ সত্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপ দেখিলে লোকে তাঁহার মুখে পরলোক প্রভৃতি পরোক্ষ সত্যে কেন বিশ্বাস করিবে?

জল্পনা ব্রাহ্ম সাধনার প্রধান ব্যাঘাত বলিলেন। জল্পনা, ইন্দ্রিয়শক্তি...বাধা জন্মায়।

নীহারেণ প্রাবৃতাঃ।

অনেক দিনের পরীক্ষার কথা যে চায়, সে পায়।

যব দেনে তব দেনে অই হায় মুক্তার তুঝি কাম।

আমার কাজ কেবল পড়ে পড়ে ডাকা আমাদের কিছুরই মূল্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

৪—১—৯৪

ভোলা গিরি—গিরি সম্প্রদায়ের নেতা, গত কুম্ভমেলায় যিনি সন্ন্যাসীদলের

সভাপতি হন অস্য তাঁহার সহিত সাক্ষাতে এই উপদেশ লাভ হইল :—

(১) এক গরিবের ছেলে এক রহিমের বাড়ী খেলিতে গিয়াছিল, রহিম তাহাকে এমনি চড় মারে যে, তাহার গাল হইতে রক্ত বাহির হয়। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার বাটীতে পিতার নিকট আসিল। পিতা কোলে লইয়া আহত স্থানে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। একদিন ঘোড়সোয়ার হইয়া রহিমের বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়াতে অনেক জিনিষ পত্র তছরূপাত হইল। কলেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি ক্ষতি বোধ হইল? রহিম বলিলেন, হুজুর কিছুই নয়. দৈবাৎ ঘোড়া ক্ষেপিয়া হইয়াছে আমি সব ঠিক করিয়া লইব। রহিম কলেক্টারের গোলামের মত আনুগত্য করিতে লাগিল।

এই কলেক্টার আমাদের আত্মা, রহিম কাম ক্রোধাদি এক এক রিপু। রিপুলাঞ্ছনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তহবিলদারী পদ পাইলে রিপু গোলাম হয়।

ছেলে সে কষ্ট ভুলিল না। সে সহরে গিয়া খুব লেখা পড়া শিখিয়া এল; এবং বি এ পাস হইয়া শেষে কলেক্টর, হইয়া আপনার দেশে আসিল এবং তাহার বাড়ীতেই কাছারী করিবার অনুমতি পাইল। কত জমিদার ডালী-স্কন্ধে তাহার দ্বারস্থ। রহিমের চড় তাহার মনে আছে. কিন্তু রহিম তাহা ভুলিয়াছে। সে এক এক করিয়া সকলের ডালী লইয়া সর্ব্বশেষে রহিমের ডালী লইল এবং সৌজন্য করিয়া বলিল, আপনার বড় ক্লেশ হইয়াছে দেখিতেছি। রহিম বলিল, হুজুর কিছু কষ্ট নাই। পরে রহিমকে বলিল, আমার একটি পাকা সরকারী কাছারী করিতে হইবে ও তাহার নিকট ছাউনী বসিবে। রহিম বলিল, তা আর কি হুজুর, আমি জায়গা দিব, পাকা ইট আছে সব অল্প দিনে প্রস্তুত হইবে। কলেক্টর বলিল, দেখিবেন কাহারও উপর কোনও অত্যাচার না হয়, রহিম তথাস্তু বলিয়া বাড়ী গাঁথার উদ্যোগ করিলেন। এদিকে কলেক্টর এক ব্যক্তি মেথরকে ঘৃণা করে; কেন না তাহার বাটীতে কোথাও হাড়, কোথাও মল কোথাও ময়লার পাত্র সকল পড়িয়া আছে। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষে এই দেহ দেখিলে কি তদ্রূপ তাহা নহে? সংসারে বৈরাগ্য হইলে প্রেমের পথ পায়।

ভোলাগিরি বলেন, অন্ধ বোবা কালা ইত্যাদি হওয়া পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল, এবং ইহাদের ইহ জন্মে সদ্‌গতির উপায় নাই। আমি তাঁহাকে কালা বোবা স্কুলের কথা ও বালকদের উন্নতির কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া একদিন স্কুল দেখিতে আসিলেন এবং ছেলেদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

দীক্ষা।

(কথা-উপনিষৎ)

ছান্দোগ্য উপনিষদ——৪ প্রপাঠক।

"গুবোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানম্,
শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ॥"

শান্তি পাঠঃ

আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বানি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত-নিরাকরণং মেহস্ত। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

শান্তি পাঠ

পুষ্ট হউক আমার সমস্ত অঙ্গ, পুষ্ট হউক আমর ইন্দ্রিয়সকল, আমার বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল, আমার প্রাণ। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য—ঋষি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস না করি, অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার, আমার নিকট তাঁহার—আমাদের উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ বর্ত্তমান থাকুক। আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষদের ধর্ম্ম প্রকাশিত হউক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—হরিঃ ওঁ।

১

পুণ্য কুশক্ষেত্র উপনিষদের পবিত্র তীর্থ। শান্তসলিলা—মাতার স্তন্যধারা রূপিণী স্রোতস্বতী সরস্বতী পুণ্য কুশক্ষেত্রের চরণ বেড়িয়া কত না কলস্রোতে নৃত্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সেই পূতপুণ্য সরস্বতী-তীরে, কুশক্ষেত্রে হরিদ্রুতনয় ঋষি গৌতমের আশ্রম তপোবন; গৌতমের তপঃক্ষেত্র—শান্ত নিভৃত।

অদূরে পরপারে একখানি কুটীর—ছায়ায় ঢাকা; উহা জননী জাবালার কুটীর। সে কুটীরে জননী জাবালা একমাত্র স্নেহের নিধি, সংসারের একমাত্র অবলম্বন পুত্র সত্যকামকে বক্ষে করিয়া জীবনের সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছেন।

একদিন এক মধুর প্রভাতে কিশোর কুমার সত্যকাম মাতার চরণে আবেদন জানাইল,—

"মা, মা, আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিখবো।"

ছলছল আঁখি জননী পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

"বাপ, আমায় কি করিতে হইবে?"

"আমার গোত্র কি বলিয়া দাও।"

অবনতমুখী জননী অন্যমনা হইলেন। বলিলেন, "বাপ, কি গোত্র তোর জানি না। আমি বহু আরাধনা করিয়া তোকে লাভ করিয়াছি। আমি তোর মা, তুই

আমার বাছা ; অন্য পরিচয় কিছু জানি না। আচার্য্য শুধাইলে বলবি,—আমি সত্যকাম জাবাল।"

২

ঊর্দ্ধে ঐ বিরাট শান্ত সত্তা—আকাশ। তাহারি তলে তপঃক্ষেত্র—গৌতমের কুটীর-প্রাঙ্গণ হোমাগ্নির চকিত শিখায় উদ্ভাসিত। শিষ্যগণ শান্তচিত্ত, ধ্যানচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা শুনিতেছে, গৌতম কহিতেছেন।

এমন সময়ে সত্যকাম আসিয়া ঋষির চরণযুগল বন্দনা করিল।—"ভগবন্, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিখিব, আমি আপনার শিষ্য, আমায় দীক্ষা দিন।"

"বৎস, কি নাম তোমার?"

"সত্যকাম, প্রভো।"

"বৎস, গোত্র কি তোমার? উপনয়ন অনুষ্ঠানে গোত্র-কুল-পরিচয় আবশ্যক।"

"ভগবন্, গোত্র-কুল আমার কি তাহা আমি কিছুই জানি না। জননীকে জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কিছু বলিলেন না। আনমনে অবনত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুধু বলিলেন,—"বাপ, বহু আরাধনায় তোকে লাভ করিয়াছি। ভর্ত্তৃহীন অভাগিনীর পুত্র তুই। আচার্য্য শুধাইলে বলবি,—'আমি সত্যকাম জাবাল'।"

শিষ্যগণ স্বেচ্ছান্তরে বারেক হাসিল। নয়নে নয়নে ভ্রূকুটির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

তাপস গৌতম তরুণ বালকের শির চুম্বিলেন।

"বৎস, সৌম্য!"

"ভগবন্।"

"আজ কুটীরে ফিরিয়া যাও, কাল প্রভাতে আসিয়ো।"

সত্যকাম ঋষির চরণধূলি মাথায় লইল।

৩

রজনীর প্রথম যামে সত্যকাম তারকা-কোটী কুন্তলের ন্যায় ক্ষীণ সরস্বতী পার হইয়া চলিল। যাইতে যাইতে সে একবার চারিদিকে চাহিল। কুটীর-দুয়ারে দেখিল, তাহার মা দীপটি জ্বালিয়া আকুল-নয়নে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। সত্যকাম সব ভুলিল। তাড়াতাড়ি আসিয়া জননীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। অশ্রুসিক্তা জননী পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন।

৪

স্নাতপূত—চিরপূত সুন্দর সত্যকাম প্রভাতে আসিয়া গুরুর চরণ বন্দনা করিল।

"গুরুদেব, সত্যকাম—আমি আসিয়াছি।"

গুরু শিষ্যের মাথায় হাত দিলেন। বলিলেন,—

"তুমি, সত্যকাম জাবাল?"

"আমি সত্যকাম জাবাল।"

"ব্রাহ্মণ তুমি। বৎস, আমি এই শুভ ক্ষণে—এই পবিত্র প্রভাতেই তোমাকে উপনীত করিব। সত্যকাম, সমিধ আহরণ কর, হোমকার্য্য সম্পন্ন করিব।"

অনন্তর সত্যকাম সমিধ আহরণ করিল। মহর্ষি গৌতম বালকে সত্যকামকে উপনয়ন-সংস্কারে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষাশেষে বলিলেন,—

"হে সৌম্য! এই চতুঃশত কৃশ অবল গো; তুমি ইহাদের অনুসরণ কর। উত্তমরূপে ইহাদিগকে পরিপুষ্ট করিবে এবং যাবত ইহারা সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ না হয়, তাবৎ ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিবে —ইহাই তোমার সাধনা।"

গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিলেন।

৫

বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শিশির একে একে আসিল, চলিয়া গেল। আবার আসিল, আবার চলিয়া গেল। দিন বহিয়া চলিল। বল্কলবাস জীর্ণ জীর্ণতর হইল। সুকুমার অলকগুচ্ছ কৈশোর শিরে জটায় শোভিল। এমনি করিয়া সত্যকামের সাধনার দিন বহিয়া চলিল।

অরণ্যের শ্যামল স্নিগ্ধ শস্পক্ষেত্রে ও নদীর নির্মল, স্ফটিক জলে গো-কুল দিন দিন পূর্ণতর দীপ্তিশালী হইয়া উঠিল।

সাধনা পূর্ণ হইল। গো-কুল সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ হইয়াছে।

মধুর প্রভাতে সহস্রসংখ্যক ধেনু সত্যকামকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সত্যকাম আর্দ্রনয়নে কায় বিস্তীর্ণ করিয়া পূর্ণ সহস্র ধেনুকে নমস্কার করিল। গোগণ চোখ তুলিয়া সত্যকামের মুখের দিকে চাহিল। সত্যকাম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল —

"আজ তোমরা পূর্ণ হইয়াছ। চল আচার্যকুলে যাই।"

গো-কুল তাহার অনুসরণ করিল।

সেই দিন পূর্বাহ্ণে সত্যকাম আচার্য-কুলাভিমুখে গমন করিল। শুভ্র শারদ বহিয়া সন্ধ্যায় ধেনুগণসহ সে এক নিভৃত কাননে আশ্রয় লইল, এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

তপস্যায় সিদ্ধ সত্যকামের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দিক্ সমষ্টিরূপী বায়ু-দেবতা আহ্লাদে অনুগ্রহ প্রকাশ মানসে বৃষভদেহের এক বৃষে অধিষ্ঠান করিয়া সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"সত্যকাম!"

"ভগবন্!"

"সৌম্য, আমরা সহস্রসংখ্যায় পূর্ণ হইয়াছি। এখন আমাদিগকে গুরুর নিকট প্রত্যর্পণ কর।"

সেই বৃষরূপী বায়ুদেবতা পুনরায় সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বৎস, আমি তোমার নিকট পরব্রহ্মের পাদ কীর্তন করিতেছি।"

"ভগবন্, আমার নিকট পরব্রহ্মের পাদ নির্দেশ করুন।"

"পূর্বদিক্ ব্রহ্মের পাদের চতুর্থভাগ; এইরূপ পশ্চিম দিক্, দক্ষিণ দিক্ ও উত্তর দিক্ এই সমুদয়ই ব্রহ্মের পাদের এক এক অংশ। এইরূপে ব্রহ্মের পাদ চতুষ্কল—চারি অবয়ব বিশিষ্ট। সেই চতুষ্কল ব্রহ্মপাদ "প্রকাশবান" নামে অভিহিত। *

* "প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম।" (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

"ব্রহ্মের প্রথমপাদ কীর্ত্তন করিলাম, অপর পাদত্রয় পরে জানিতে পারিবে। দ্বিতীয় পাদ অগ্নি বলিবেন।"

৭

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রকাশ—সমগ্র বিশ্বে যাঁর—তাঁরি, সত্যকামের হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। নিখিল ভুবন ভরিয়া অন্তরে বাহিরে, গন্ধে বর্ণে গানে, প্রকাশ—তিনিই প্রকাশিত। সত্যকাম সত্যলাভ করিল। দীক্ষা আরম্ভ হইল। অনাহত সে রাগিণী—যে নিখিলে বাজিতেছে। সে সুর, সে গাথা আজ তাপসের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারিয়া উঠিল।

বিশ্বে তাঁহারি প্রকাশ, তিনিই প্রকাশ, প্রকাশ তাপসের মাঝারে। নবীন অরুণে, নব আনন্দে, নব জাগরণে বিশ্ব জাগিল। ভুবন ভরিয়া প্রকাশ—আনন্দ।

সত্যকাম আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল। নব নব সরস তৃণে রসনা ও উদর তৃপ্ত করিয়া গোগণ আহার অনুসরণ করিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; এবং ক্রমে উহা রাত্রির গহ্বরে প্রবেশ করিল। গোসকল সম্মুখীন হইয়া একত্র মিলিত হইল। অগ্নি সমাধানান্তে সত্যকাম তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল; এবং সমিধ প্রক্ষেপপূর্ব্বক বৃষের বাক্য ধ্যান করত অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল।

"সত্যকাম?" অগ্নি সম্বোধন করিলেন।

"ভগবন্।" সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল। এবং জিজ্ঞাসা করিল,—

"ভগবন্, আপনি ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ বলিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; তাহা উপদেশ করুন।"

"পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও সমুদ্র ইহারাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদের অবয়ব। সেই চতুষ্কল ব্রহ্মপাদ (দ্বিতীয়) "অনন্তবান্" নামে অভিহিত।" *

ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তৃতীয় পাদ 'হংস'—আদিত্য উপদেশ করিবেন।

৮

প্রভাত হইল। অনন্তবান্ অনন্ত বিশ্বে অনন্তেরই প্রকাশ। অনন্ত গগনে অরুণ-প্রকাশ। অনন্ত সমুদ্র-লহরী-বক্ষে, উন্মুক্ত অনন্ত আকাশ-তলে অনন্ত পৃথিবী নব আলোকে উদ্ভাসিত—প্রকাশিত। স্বর্গ ঊর্দ্ধে নয়, নিখিল ভরিয়াই।

সত্যকাম জাগিল, জগৎ চাহিয়া দেখিল ভূমা—অনন্ত। ক্ষুদ্রহৃদয় ক্ষুদ্র সে, শুধু সত্যকাম—সে আজ সকল ব্যাপিয়া সকল ভরিয়া! অনন্ত তাহার মাঝারে আজ সান্ত! সে-সান্তে কত বিচিত্র প্রকাশ, সে-প্রকাশ অনন্তেরই। ক্ষুদ্রে-বিপুলে যোগ—সসীমে-অসীমে যোগ। সত্যকাম অনন্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। এবং সেই অনন্ত প্রকাশকে নমস্কার করিল।

সত্যকাম ধেনুগণসহ আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল।

---

* পৃথিবী কলাঽন্তরীক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥ (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

আবার রাত্রি আসিল। গোগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র মিলিত হইল। সত্যকাম অগ্নি সমাধনান্তে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল। সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নির বাক্য চিন্তা করত উপবেশন করিল।

"হে সত্যকাম," হংস (আদিত্য) সম্বোধন করিলেন।

"ভগবন্," সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল। এবং জিজ্ঞাসিল, "ভগবন্, আপনি 'ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ বলিতেছি' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন তাহা বলুন।"

"অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ ইহারাই ব্রহ্মের তৃতীয় পাদের কলা—অবয়ব। এইরূপে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ চতুষ্কল—চারি অবয়ব-বিশিষ্ট। এই চতুষ্কল ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ "জ্যোতিষ্মান্" নামে অভিহিত।* "হে সৌম্য, মদ্গু † তোমায় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ উপদেশ করিবেন।"

৯

রাত্রি প্রভাত হইল। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ—অনন্ত বিশ্বে।

সবিতা জ্যোতিষ্মান্, বিদ্যুৎ, অগ্নি, চন্দ্র তারা তো সবিতারই ছায়া। সবিতা সেই অনন্ত জ্যোতিরই কণিকা মাত্র। সান্ত সবিতা—প্রকাশ। প্রকাশ অনন্তের। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশের—সবিতার ভিতর দিয়া জল স্থল নভোমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় করিয়া আজ কোমল কুসুমদল সত্যকামের নয়নপল্লবে জ্যোতির রেখা আঁকিয়া দিল। সত্যকাম হৃদয় খুলিয়া সেই অনন্ত প্রকাশ জ্যোতিষ্মান্‌কে দেখিল। ভিতরে বাহিরে জ্যোতি। তাপস ক্ষুদ্র কর দু'টি জুড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল।

সত্যকাম ধেনুগণসহ আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল।

রাত্রি আসিয়াছে। পাখীরা দিবসের গান সাঙ্গ করিয়া নীড়ে আসিয়াছে। গোসকল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র মিলিত হইল। অগ্নি সমাধনান্তে সত্যকাম তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, এবং সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক আদিত্যের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল।

"সত্যকাম!" মদ্গু সম্বোধন করিলেন।

"ভগবন্," সত্যকাম উত্তর করিল। এবং জিজ্ঞাসিল, "ভগবন্, আপনি ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এখন তাহা বলুন।"

মদ্গু কহিলেন, "প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন ইহারাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ চতুষ্কল—চারি অবয়ব বিশিষ্ট। এই চতুষ্কল-বিশিষ্ট চতুর্থ পাদ 'আয়তনবান্' নামে অভিহিত।"*

সত্যকাম নমস্কার করিল।

* "অগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সৌম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম।" (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

† জলচর পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ী।

* "প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সৌম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম।" (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

১০

প্রভাত হইল। পাখী গাহিল, কিরণ জাগিল। আজ দীক্ষা পূর্ণ। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ মন প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া আজ সত্যকামের নিকট প্রকাশিত। নয়নে বিশ্বের রূপ, শ্রোত্রে অনাহত বিশ্ব-রাগিণী, প্রাণে প্রকাশ অনন্তের, সকল মিলিয়া একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টির কল্পনা—মনে। নব নব রূপে গন্ধে গানে ভাবে আজ বিপুল তিনি, মহান্ তিনি, নয়ন মন শ্রোত্র প্রাণের ভিতর দিয়া সত্যকামের নিকটে আসিয়াছেন। দীক্ষা শেষ হইয়াছে।—শেষ আর কি সে, চিরঅনন্ত চিরনবীন। দীক্ষা—জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ আয়তনবান্। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ আজ সত্যকামের বিভিন্ন স্তরসমূহের ভিতর একখানি অখণ্ড বিচিত্র সুরের রাগিণী জাগাইয়া তুলিয়াছে। সত্যকাম দেখিল, শুনিল, জানিল, অনুভব করিল—পাইল। আজ সে যুক্ত—সকল রকমে সেই বিরাটের সাথে। এই যোগ—মহান্ যোগের রক্ষি-দীক্ষা বাঁধিয়া দিল।

সত্যকাম পূর্ণ-সহস্র ধেনু সমভিব্যাহারে আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইল। এবং তাঁহার পূত চরণরেণু মাথায় লইল।

"সত্যকাম?"

"ভগবন্!"

"তোমার মুখ এত উদ্ভাসিত কেন?"

সত্যকাম সস্মিত অবনতমুখে রহিলেন। তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া আচার্য্য বলিলেন;—

"বৎস, প্রিয়দর্শন, তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় দেখিতেছি। যিনি প্রসন্নেন্দ্রিয়, প্রহসিতানন, নিশ্চিন্ত এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিজ্ঞানবান্। বৎস, তোমাতে এ-সবই দেখিতেছি। তোমার ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন, বদনে অকৃত্রিম হাস্য, ললাটে চিন্তার কোনো ছায়া নাই, তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ। তোমার দীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি ব্রহ্মবিজ্ঞানবান্ হইয়াছ।" এই বলিয়া আচার্য্য সত্যকামকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, কে তোমায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছেন?"

সত্যকাম, আবেগভরা ছল ছল আঁখি দু'টি তুলিয়া বলিল, "দেবতারা—তাঁরা তো আপনিই! আপনিই, গুরুদেব! আপনিই আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন।"

"তবে শোনো বৎস, আবার বলি—'জ্যোতিষ্মান্ অনন্তপ্রকাশ আয়তনবান্ ব্রহ্ম সৎ চিৎ এবং আনন্দ। অরূপ রূপের, অসীম সীমার মাঝে আপন সুর বাজাইতেছেন, স্থূল সূক্ষ্ম স্থূল সূক্ষ্মাতিরিক্ত ইন্দ্রিয় মন প্রাণের নিকট ধরা দিতেছেন। সত্যকাম, প্রিয়দর্শন, তোমার দীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি আজ পূর্ণকাম সিদ্ধকাম।'"

সত্যকাম আপন ভুলিয়া গুরুর চরণ চুম্বন করিল। গুরুও শিষ্যকে বক্ষে তুলিয়া তাঁহার শির চুম্বন করিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সংবাদ।

১। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন।—মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিগ্রো সম্প্রদায়ের নেতা কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন অধঃপতিত নিগ্রো জাতির সংস্কার ও উন্নতিকল্পে আজীবন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া ইহজগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন অসাধারণ অধ্যবসায়, কর্ম্মপটুতা ও স্বজাতিপ্রীতি-প্রভাবে নিগ্রোদিগকে যুক্তরাজ্যের রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্থায়ীর আসন প্রদানে কৃতকার্য্য হইয়া স্বয়ং ধন্য ও জগৎবাসীর বরেণ্য হইয়াছিলেন। কর্ম্মানুরাগ স্বজাতিপ্রীতি মনুষ্যকে কিরূপ মহান করিতে পারে বুকার ওয়াসিংটনের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। শিক্ষার বিস্তার ও মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মার্কিণ রাজ্যে বুকার ওয়াসিংটনের পুণ্যস্মৃতি চিরদিন জাগরুক থাকিবে।

২। জাপান সম্রাটের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্রাট এই উপলক্ষে প্রজাবর্গের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ইংলণ্ড সবমেরিণ ধরিবার এক নূতন জাল পাতিয়াছে। ইহাতে ৪০ খানা জর্ম্মণ সবমেরিণ ধরা পড়িয়াছে, এরূপ শুনা যাইতেছে।

৪। জর্ম্মণী এক প্রকার নূতন অটোমেটিক রাইফেল আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে প্রতি মিনিটে ২৫টা করিয়া গুলি নিক্ষিপ্ত হয়।

৫। আগামী ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষা যথাক্রমে ১৯১৬ সালের ১৩ই ও ২০শে মার্চ্চ আরম্ভ হইবে।

৬। মিস্ কভেলের পাশবিক প্রাণদণ্ড।—ইংরাজ কুমারী মিস্ কভেল বেলজিয়মে আহত সৈনিকের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুণ্যবতী স্নেহশীলা নারী শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকল সৈন্যেরই শুশ্রূষা করিতেন। অনেক জর্ম্মাণ সৈন্য ইঁহার করুণায় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। এই বালিকা দয়াপরবশ হইয়া কতিপয় বেলজিয়ম সৈন্যের পলায়নের সহায়তা করায় জর্ম্মাণগণ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ১১ই অক্টোবর তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেন। এই বালিকার বয়ঃক্রম মাত্র ১৭ বৎসর। বালিকা মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত স্থির ও শান্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহাই আমার সুখ যে, আমি জন্মভূমির জন্য আমার প্রাণ দান করিতেছি। বীর নারীর ন্যায় ব্রিটিশ পতাকায় স্বীয় অঙ্গ বিভূষিত করিয়া বালিকা নীরবে মৃত্যুকে বরণ করেন। এই সেবিকা বালিকার নৃশংস হত্যার কথা চিরকাল মানব মনকে পীড়িত করিবে।

বামারচনা।

অতিথি

১

বিদেশী অতিথি আমি তোদের আলয়ে
ঘুচাইতে ভুল-ভ্রান্তি
এসেছি লভিতে শান্তি,
এসেছি এ দেব দেশে তাপিত-হৃদয়ে।

২

এ যে মোর তীর্থ-ভূমি চিরজনমের
এ দেশের পাতা লতা,
কয় সে দেবের কথা,
এ দেশের পাখী গান গায় সে দেবের।

৩

তারি পরিমল ল'য়ে ফোটে হেথা ফুল।
বায়ু তারি বাস বয়,
সদাই এ দেশময়
তারি প্রেমে মত্ত হ'য়ে ছোটে অলিকুল।

৪

এ দেশের তরুলতা সকলি সুন্দর!
হেথাকার ধূলা-ঢাকা,
তাহারি পদাঙ্ক-আঁকা
হেথাকার তৃণগুচ্ছ কত মনোহর!

৫

এখানে যমুনা গঙ্গা সদা ব'য়ে যায়।
কি অমৃত কি পবিত্র,
এখানে বিরাজে নিত্য;
কত তীর্থ-ফল লভি' আসিলে হেথায়।

৬

কি হবে অযোধ্যা, কাশী, গয়া বৃন্দাবন ?
এ পুণ্যভূমির কাছে,
কোন্ তীর্থস্থান আছে ?
তীর্থ—সে তো দাম্ভিকের দম্ভের কারণ!

৭

এ মোর তপস্যা-ভূমি চিরসাধনায়।
তাই তো আকুল প্রাণে
আসিয়াছি এই খানে;
এ পুণ্য ভূমিরে করি কোটি নমস্কার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

ভালো ও মন্দ

পরের মন্দ করতে গেলে
নিজের মন্দ আগে হয়,
এ কথাটি নয় কো প্রবাদ—
খাঁটি সত্য এ নিশ্চয়।
তেমনি পরের ভালোটুকু
করলে নিজেরভালো হয়,
পরের সেবা, দয়া, দানে
আপনার লাভ আগে হয়।

শ্রীন নীবালা দেবী।

৩৭ নং মথুরবাবু লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 629. January, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৯ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩২২। জানুয়ারি, ১৯১৬। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

BENGAL LIBRARY
MAR 23. 1916
BUILDINGS

গান।

মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের
আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা
হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে
বক্ষে তুলে;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুটবে বাণী।
আমার বীণাখানি পড়চে আজি
সবার চোখে।
হের তারগুলি তার দেখ্‌চে গুণে
সকল লোকে।
ওগো কখন সে যে সভা তোজে
আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠ্‌বে বেজে
করুণ রবে;—
যখন তুমি তারে বুকের পরে
লবে টানি।

২

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে।
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয়-মাঝে আসি লাগে।
রহি' রহি' মম মন-গগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবিরাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে
মোর পথের আগে।
